Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুলিয়া আক্তার

রোলঃ 227021799

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুলিয়া আক্তার

রোলঃ 227021799

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জুলিয়া আক্তার, আইডিঃ 227021799 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

জুলিয়া আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

জুলিয়া আক্তার

আইডিঃ 227021799

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

আত্মার ব্যাধি

ভূমিকা

রুহ বা আত্মা কী?

روح کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 'روح 'کی حقیقت کے بارے میں جواب نہیں دیا، بلکہ وحی الٰہی کا انتظار فرمایا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا:﴿ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ﴾]الاسراء:۸۵ [اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بات کی ہدایت فرمادی کہ روح ایک امر ربی ہے، یعنی روح بھی میر ے ر بّ کے امرکن ہی سے ہے اور اس کی مخلو ق ہے ۔

রুহ বা আত্মা সম্পর্কে নবীজি ﷺ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তো তিনি ﷺ নিজেই রুহ বা আত্মা সম্পর্কে উত্তর দেননি। বরং অপেক্ষা করেছেন আল্লাহর ওয়াহির। আল্লাহ تبارک وتعالی (কুরআনে) ওয়াহি নাযিল করেন "قل الروح من امر ربي" - 'বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের হুকুমঘটিত।' (Al-Isra' 17:85)

আল্লাহ তাআলা নিজের রাসূলকে এই কথার দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন যে রুহ একটি আল্লাহর হুকুম। অর্থাৎ রুহ আল্লাহর হুকুম যা কোন শব্দ দ্বারা সৃষ্টি হয়।

অন্তর মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের পার্থিব নিয়ন্তা। তার হস্তপদ, চক্ষুকর্ণ ও তাবৎ প্রত্যঙ্গ অন্তরের আজ্ঞাবহ। একজন ভালো ও মন্দ মানুষের পার্থক্য মূলত অন্তঃকরণে। বাহ্যতঃ তারা একই দেহ-কাঠামোর মানুষ, এমনকি সেক্ষেত্রে মন্দ-জন হতে পারে ভালোর চেয়েও উন্নততর। কোনো শুভক্ষণে কারোর মর্মস্পর্শী কথায় অন্তর প্রভাবিত হলে একজন উদ্ধত অপরাধী মুহূর্তেই সুমানুষে পরিণত হয়, আবার কোনো দূর্বল মুহূর্তে শয়তানের প্ররোচণায় অন্তর বিপথগামী হলে আজীবনের সুফিও হতে পারে পথভ্রষ্ট।অন্তরের এই কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতেও বিবৃত হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন-

. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'জেনে রাখো, শরীরে এমন এক মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা সঠিক থাকলে পুরো শরীর সঠিক থাকে এবং নষ্ট হলে পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যায়; তা হলো হৃৎপিণ্ড।' [সহিহ বুখারী: ৫২]

খোদাও চাও, হারাম দুনিয়াও চাও? ইহা শুধু কল্পনা, ইহা
তুমি পাগলামী, বরং অসম্ভব কাজ।

প্রতিটা মানুষ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে চায়। মানুষ চায় মৃত্যু পর্যন্ত সুস্থ থাকতে, পর্যাপ্ত পরিমাণ খাওয়া ঘুম চলাফেরা কাজকর্ম নিয়ে সবার স্বপ্ন থাকে। শারীরিক সুস্থতা সবাই চায় কিন্তু আত্মিক (অন্তরের সুস্থতা) সুস্থতার ক্ষেত্রে আমরা সবাই উদাসীন। আমরা অনেকেই মেনে নিতে চাই না আমাদের অন্তরে রোগ আছে এবং তার প্রতিকার দরকার। অসুস্থতা আসলে দুই প্রকার শারীরিক ও আত্মিক। আমাদের শরীরে যখন ব্যাধি হয় আমরা দীর্ঘ সময় চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থতা অর্জন করতে চেষ্টা করি। এতে অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকি এবং ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকি। আত্মার চিকিৎসা করার আগে আত্মার রোগ কি কি সে সম্পর্কে জানতে হবে। আত্মার রোগ অনেক রকমের হয়ে থাকে, আমরা কয়েকটি আত্মার রোগের সম্পর্কে জানব। যেমন : কুদৃষ্টি, লোভ, হিংসা, অহংকার। বিস্তারিত সামনে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

যাদুস সালেকিন
روح کی بیماری اور ان کا علاج
https://www.banuri.edu.pk/login

কুদৃষ্টি

মানুষের চোখ যখন লাগামহীন হয়ে যায় তখন অধিকাংশ অশ্লীলতা এর ওপর ভিত্তি করেই সংঘটিত হয়। এ জন্য বিজ্ঞজনদের নিকট 'কুদৃষ্টি অশ্লীলতার মূল' হিসেবে বিবেচিত। চোখের এই দুই ছিদ্রপথেই অশ্লীলতার প্রস্রবণ প্রবাহিত হয় এবং পরিবেশ ও সমাজে নগ্নতা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম চোখের এই দুই ছিদ্রপথে প্রহরার ব্যবস্থা করেছে। এটিও ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব যে, ইসলাম প্রত্যেক মুমিনকে দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ দিয়েছে। ব্যস, পরনারীর ওপর দৃষ্টিও পড়ল না, আর কামনা- বাসনাও জাগল না। বাঁশও রইল না তো বাঁশিও বাজল না। নিয়ম হচ্ছে "Nip the evil in the bud" (মন্দকে অঙ্কুরেই পিষে ফেলো)। বাস্তবতাও এমনই, যার চোখ নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার হয় তার ভেতরে কামনা-বাসনার আগুন দাউদাউ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে অশ্লীলতায় লিপ্ত করে ছাড়ে। যে সকল কারণে মানুষের ক্বলব ধীরে ধীরে নষ্ট হয় তার আরেকটি মৌলিক কারণ হলো দৃষ্টির হেফাজত না করা। কারণ মানুষ প্রথমেই কোন একটি জিনিস চোখ দিয়ে দেখে, তারপর চিন্তা-ভাবনা করে, তারপর অঙ্গ দ্বারা বাস্তাবায়ন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

'মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটিই তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন। (সূরা নূর ৩০)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ

দৃষ্টি ইবলিসের তিরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তির। (মুসনাদুশ শিহাব, ২৯২)

পরনারীর দিকে কামাতুর দৃষ্টিতে দেখা অনিষ্টের মূল। শয়তান বেগানা নারীর চেহারা আকর্ষণীয় করে পেশ করে। তা ছাড়া দূর থেকে সব জিনিসই ভালো দেখায়। এ জন্যই তো প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে, 'দূরের ঢোলের আওয়াজ সহনীয় হয়ে থাকে'। কুদৃষ্টির ফলে অন্তরে গুনাহের আবরণ পড়ে যায়। সময়-সুযোগ বুঝে তা তার রং প্রকাশ করে। কাবিল হাবিলের স্ত্রীর সৌন্দর্যে দৃষ্টি দেয়ার কারণেই তার মন ও মস্তিষ্কে এমন 'ভূত' চাপল যে, সে তার নিজ ভাইকেই হত্যা করে ফেলল। দুনিয়াতে সেই সর্বপ্রথম অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়।

কুরআন মাজীদে তার এহেন মন্দ কাজের আলোচনা উঠে এসেছে। কেয়ামত পর্যন্ত যত হত্যার গুনাহ হবে তার একটা অংশ তার ওপর আসতে থাকবে। বোঝা গেল প্রথম দৃষ্টি দেয়া না দেয়া তো নিজের ইচ্ছাধীন। কিন্তু দৃষ্টি দেয়ার পরের পরিস্থিতি ইচ্ছার বাইরে চলে যায়।

چلے کہ ایک نظر تیری بزم دیکھ آئے ...یہاں جو آئے تو بے اختیار بیٹھ گئے

চলো তোমার মেলা দেখে আসি এক পলক এখানে যে আসে অজান্তেই বসে থাকে অপলক। এ জন্যই উত্তম হচ্ছে প্রথমবার দেখা থেকেই বেঁচে থাকবে। আশঙ্কায় ফেঁসে যাওয়া সচেতন লোকদের কাজ নয়।

হামিদুল্লাহ আল খায়েরের ঘটনা

হযরত নিজামুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট খলীফা। বড় আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। নাম হামিদুল্লাহ আল খায়ের। হাজার হাজার মুরিদ ছিল তার। একবার জনৈক মুরিদের বাড়িতে মেহমান হলেন। মুরিদের ছয়-সাত বছরের একটি মেয়ে খানা পরিবেশন করতে এলো। হামিদুল্লাহ আল খায়ের মেয়েটির দিকে দৃষ্টি দিলেন। মেয়েটির রূপ লাবণ্যও ছিল দেখার মতো! মেয়েটিকে দেখার পর পীর সাহেবের মনে শুধুমাত্র এতটুকু ধারণা এলো, যে ব্যক্তি এ মেয়েটির জীবনসঙ্গী হিসেবে আসবে সে হবে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।

এতটুকু ধারণা হতেই তিনি আঁচ করতে পারলেন, ঘরের ভেতর থেকে কী যেন উড়ে গেল। নিজেকে একেবারে শূন্য মনে হতে লাগল। তার মুরিদানদের বলে দিলেন, তোমরা একটু খবর নিয়ে আসো, মানুষ আমার প্রতি কেমন ধারণা রাখে, আমি আমার বেলায়েত সব হারিয়ে ফেলেছি। মুরিদানগণ বললেন, আপনার ব্যাপারে মানুষ সুধারণা ছাড়া কিছুই রাখে না। সব মানুষের অন্তরে আপনি শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন।

তিনি বললেন, না এই মুহূর্তে মানুষ আমার ব্যাপারে কী ধারণা করছে, সেটা খবর নিয়ে আসো!

এরপর মুরীদানরা রাস্তায় বের হলো। যার সাথেই সাক্ষাত হলো তাকেই জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, হামিদুল্লাহ আল খায়েরের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? সকলেই একই উত্তর দিতে লাগল যে, তিনি তো অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন; কিন্তু আজকাল নাকি নিজের মুরিদের মেয়ের প্রতি তিনি আসক্ত হয়েছেন। পীর সাহেবের কানে এ সংবাদ এলে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতির সাথে তওবা করে পূর্বের অবস্থা ফিরে পেতে দোয়া করেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।

সামান্য সময়ের বদ নজরির কারণে আল্লাহ পাক যুগশ্রেষ্ঠ দুজন ওলিকে অপদস্থতার শেষ সীমায় নিয়ে গেলেন। অথচ আমরা অহরহ এ গোনাহটি করে থাকি, কিন্তু তেমন কোনো বিপদের সম্মুখীন হই না কেন? এর উত্তর হলো-

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينِ

অর্থাৎ সাধারণ আবেদগণের মতো আমল করা ওলিদের মানায় না, বরং এটা আল্লাহর কাছে তাদের ত্রুটি হিসেবে সাব্যস্ত হয়। যেমন, আপনি সাধারণ পরিচিত মানুষ থেকে যে ব্যবহার

পান আপনার আন্তরিক বন্ধু বা প্রিয়জন থেকে সে রকম ব্যবহারের আশা করেন না, বরং আরো সন্তোষজনক ব্যবহারের আশা করেন।

এখন যৌবন যার
তাযকিয়াতুন নুফূস
এখন যৌবন যার
যাদুস সালেকিন

যবানের গুনাহ

আল্লাহ মানুষকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন। মনের ভাব প্রকাশ করার ভাষা দিয়েছেন। এ মানুষের প্রতি আল্লাহর এক মহা দান। পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়, যারা এ নিআমত থেকে চিরবঞ্চিত। সুতরাং যাদেরকে আল্লাহ এ নিআমত দান করেছেন তাদের উচিত এর যথাযথ ব্যবহারের প্রতি যত্নবান হওয়া।

আল্লাহর এ নিআমতকে মানুষ তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে- এ শক্তি আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। এখন মানুষ তার এ শক্তিকে ভালো কাজে ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে; অথবা মন্দ কাজে ব্যয় করে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত হতে পারে।

অমরা যাতে আল্লাহর দেয়া এ নিআমতকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারি, যবানের অনিষ্ট থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি- এজন্য নবীজী আমাদের এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা দিয়েছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ .

যে আমাকে তার দুই চোয়ালের মাঝের অঙ্গ অর্থাৎ যবান এবং দুই পায়ের মাঝের অঙ্গের (সঠিক ব্যবহারের) যামানত দিবে আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪

নবীজীর প্রিয় সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল রা. বলেন, একবার নবীজীর সাথে কোনো এক সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে নবীজীকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

.يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدنِي عَنِ النَّارِ

আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।

(তখন নবীজী তাকে দীর্ঘ উপদেশ দিলেন, এক পর্যায়ে বললেন,)

أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ :بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ :كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ :يَا نَبِيَّ اللهِ !وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ :ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى .وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

এ সবকিছুর মূল কী- আমি কি তোমাকে বলে দিব? আমি বললাম, জী, আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, এটাকে সংযত কর। এ কথা শুনে আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের কথাবার্তার জন্যও জিজ্ঞাসিত হব? নবীজী বললেন, আরে! যবানের কামাই-ই তো মানুষকে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে! -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬১৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৯৭৩

হাঁ, যবানের অনিষ্ট এত ব্যাপক, তা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে ফেলে। বে-পরোয়াভাবে মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই বলতে থাকে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত হয়। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ .بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, যেদিকে সে খেয়ালই করে না, কিন্তু এর কারণে আল্লাহ তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। আবার বান্দা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার মত কথা বলে, যেদিকে সে ভ্রুক্ষেপই করে না; কিন্তু তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে পৌঁছায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৮

আমাকে ভাবতে হবে- কী বলছি, কী বলা উচিত। কারণ, আমার গুরুত্বহীনভাবে বলা কথাও আমার কত বড় ক্ষতি সাধন করতে পারে- উপরের হাদীস থেকে জানতে পারলাম। তাছাড়া আমার সব কথা তো লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

.اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

স্মরণ রেখ, দুই গ্রহণকারী ফিরিশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত। -সূরা কফ (৫০) : ১৭-১৮

সালাফ তাদের শীষ্য-সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সতর্ক করতেন। সুফিয়ান ছাওরী রাহ. একদিন তাঁর সঙ্গীদের বললেন-

لَوْ كَانَ مَعَكُم مَنْ يَرْفَعُ حَدِيْثَكم إِلَى السُّلْطَانِ، أَكُنْتُم تَتَكَلَّمُوْنَ بِشَيْءٍ؟

তোমাদের সঙ্গে যদি এমন কেউ থাকে, যে তোমাদের কথা সুলতানের কাছে পৌঁছে দিবে, তোমরা কি কোনো কথা বলবে?

সঙ্গীরা বললেন- ﻻ জী না

তিনি তখন বললেন-

فَإِنَّ مَعَكُم مَنْ يَرْفَعُ الحَدِيْثَ.

তাহলে জেনে রেখ, তোমাদের সাথে এমন লোক আছেন যিনি কথা পৌঁছান। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৬৮

আল কাউসার: https://www.alkawsar.com/bn/article/1851/

গীবত

গীবতের অর্থ অনুপস্থিত কারো এমন কোনো বিষয় কারো কাছে উল্লেখ করা, যা সে কোনোক্রমে জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবে বা অপছন্দ করবে। যদি বিষয়টি কোনোভাবে তার জানার সম্ভাবনা নাও থাকে তবু তা গীবত। চাই তা তার শারীরিক অসম্পূর্ণতা হোক; যেমন: চোখ ট্যারা হওয়া, মাথায় টাক হওয়া, লম্বা হওয়া, খাটো হওয়া ইত্যাদি। অথবা বংশ নিয়ে হোক; যেমন: এ-কথা বলা যে, তার পিতা কামলা, খারাপ, ফাসিক, নিকৃষ্ট ইত্যাদি। অথবা চরিত্র নিয়ে হোক; যেমন: এ-কথা বলা যে, তার চরিত্র খারাপ, সে কৃপণ, অহংকারী ইত্যাদি। অথবা কাপড়-চোপড় নিয়েই হোক; যেমন: এ-কথা বলা যে, তার জামা লম্বা, আস্তিন চওড়া, কাপড়টি নোংরা ইত্যাদি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গীবত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'গীবত মানে তোমার ভাইয়ের এমন কোনো বিষয় উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে।' প্রশ্ন

করা হলো, 'আমি যে-দোষ-ত্রুটির কথা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে এ-ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য?' তিনি
বললেন, 'তুমি যা বলো তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তবেই তুমি গীবত করলে। আর যা তার মাঝে নেই, তা বললে সেটি হবে অপবাদ।

যবানের দ্বারা সংঘটিত গুনাহের মধ্যে গীবতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি লিপ্ত হয়। কম মানুষই এ থেকে বাঁচতে পারে। এ ব্যাপারে অবহেলার অন্ত নেই। জেনে না জেনে, বুঝে না বুঝে গীবত করতে থাকে। সকালে গীবত করে, বিকালে গীবত করে, রাতে গীবত করে; গীবতই যেন কারো কারো সারাদিনের একমাত্র কাজ। ক'জন একত্র হলে প্রথম কাজ যেন গীবত। এটা মানুষের সমাজে শত ফ্যাসাদের কারণ। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এর নিকৃষ্টতা ব্যক্ত করেছেন- নিজের মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণের সাথে তুলনার মাধ্যমে-

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِیْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا یَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَیُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ یَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِیْهِ مَیْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِیْمٌ.

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, কোনো কোনো অনুমান গুনাহ। তোমরা কারো গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাকো। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। -সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১২
গীবত সম্বন্ধে আরো বহু বর্ণনা রয়েছে। গীবত থেকে বাঁচার জন্য আজ শুধু এতটুকু জেনে নিই- গীবত ও পরনিন্দার শাস্তি কত কঠিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ :مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ :هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ.

মে'রাজের সময় আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যাদের ছিল তামার নখ। সেই নখ দিয়ে তারা নিজেদের চেহার এবং বুক ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি বললাম, জিবরীল! এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, যারা (দুনিয়াতে) মানুষের গোশত খেত (গীবত করত) এবং মানুষের সম্মান হানি করত। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৩৪০

গীবত থেকে বেঁচে থাকার তরিকা

গীবত এমন বদঅভ্যাস, যার কারণে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতে চরমভাবে লজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। আমি সংক্ষিপ্তভাবে গীবতের ক্ষতির কথা বলতে চাই। যেগুলো বারবার স্মরণ করলে গীবতের রোগ দূর হতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

(১) গীবতের ক্ষতি হচ্ছে এর দ্বারা বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। পরস্পর বিবাদের কারণে ঝগড়া-লড়াই, মামলা-মোকাদ্দমা সব কিছু হতে থাকে। একত্রে ও একসঙ্গে থাকার কারণে যে কল্যাণ হয়, গীবতের কারণে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর মানুষ সেই ফায়দা থেকে মাহরুম ও বঞ্চিত হয়।

(২) গীবত করার সঙ্গে সঙ্গে দিলের মধ্যে এমন জুলমত ও অন্ধকার সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা মানসিক কষ্ট হয়। যেন কেউ অন্তরের মধ্যে ময়লা-আবর্জনা ফেলে দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত করে ফেলেছে। যার দিলের মধ্যে সামান্য অনুভব-অনুভূতিও রয়েছে, সে এই ক্ষতিটা অনুধাবন ও উপলব্ধি করে।

(৩) গীবত করার দ্বারা দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতে ক্ষতি হয়। যার গীবত করা হয়েছে সে যদি এটা শোনে, তা হলে গীবতকারীকে অপমান ও লাঞ্ছিত করে। যদি ক্ষমতা থাকে, তাহলে খারাপভাবে তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ে। দ্বীনি ক্ষতি হলো, গীবত করার দ্বারা আল্লাহ পাক নারাজ হন। আর আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি ও নারাজি হলো জাহান্নামে যাওয়ার সামান ও উপকরণ। নাউযুবিল্লাহ!

(৪) হাদিস শরিফে আছে, গীবত যিনার চেয়েও মন্দ ও ক্ষতিকর।

(৫) গীবতকারীকে আল্লাহ পাক মাফ করবেন না, যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ করবে। গীবত হলো হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত।

(৬) গীবত করার অর্থ, নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া। কে এমন আছে, যে নিজের মৃতভাইয়ের গোশত খাবে! মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়া যেমন অপছন্দনীয়;

গীবত করাটাও তেমনি জঘন্য ও অপছন্দনীয় কাজ।

(৭) গীবতকারী ভীত হয়ে থাকে। যে কারণে পিছে-পিছে মন্দ কথা বলে বেড়ায়।

(৮) গীবত করার দ্বারা চেহারার নুর চলে যায়। আর এ ধরনের লোককে মানুষ অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

(৯) গীবতের বড় ক্ষতি হলো, গীবতকারীর নেক আমল যার গীবত করা হয়েছে, তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। যদি তাতে কমি পুরা না হয়, তা হলে যার গীবত করা হয়েছে তার গোনাহ ও বদআমল গীবতকারীর গরদানে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যে কারণে গীবতকারীকে জাহান্নামে যেতে হবে।

যাদের আমল অন্যদের দিয়ে দেওয়া হবে হাদিস শরিফে তাদের মিসকিন বলা হয়েছে। তাই যার গীবত করা হয়েছে, দুনিয়াতেই তার থেকে মাফ নিয়ে নেওয়া চাই।

তিরমিযী: ১৯৩৫; আবু দাউদ: ৪৮৭৪।
ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন
আল কাউসার

পরনিন্দা

সামাজিক ফাসাদের ক্ষেত্রে পরনিন্দা আরো মারাত্মক। পরনিন্দা বলা হয় : বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের দোষ অন্যের কানে লাগানো। পরনিন্দাকারী অন্যকে লাঞ্ছিত করতে গিয়ে একসময় নিজে লাঞ্ছিত হয়; যখন মানুষ তার আসল উদ্দেশ্য জেনে যায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ স্বভাবের নিন্দা করে বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ.

দুর্ভোগ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির, যে পেছনে ও সামনে মানুষের নিন্দা করে। -সূরা হুমাযাহ, (১০৪) : ১

আর পরনিন্দাকারীর পরিণাম বড় ভয়াবহ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.
পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৫; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ১০৫৯০

মিথ্যা

মিথ্যা সকল পাপের মূল। মুনাফিকের স্বভাব। মুমিন মিথ্যা বলতে পারে না। যে এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, সে মিথ্যা বলতে পারে না। কবীরা গুনাহের সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম হল মিথ্যা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবীগণকে বললেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহসমূহের কথা বলে দিব? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন আল্লাহর রাসূল! তখন নবীজী বললেন,

الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

আল্লাহর সাথে শির্ক করা। মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া। (এতটুকু বলা পর্যন্ত নবীজী হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন) এরপর নবীজী হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে উঠে বসলেন, বললেন, আরে ভালো করে শুনে রাখ! (বড় কবীরা গুনাহের অন্যতম হল,) মিথ্যা বলা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা বলা। নবীজী অতি গুরুত্বের সাথে এ বাক্য বারবার বলতে লাগলেন। এ দেখে আমরা (মনে মনে) বলে উঠলাম, (নবীজীর তো কষ্ট হচ্ছে!) নবীজী যদি একটু চুপ করতেন! -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৬৫৪

গালি দেওয়া

ইসলামে যবানের গুনাহের মধ্যে গালি দেওয়া অন্যতম। এটি কেবল অন্যকে কষ্ট দেয় না, বরং ব্যক্তির আত্মিক শুদ্ধতার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একজন মুসলমানের উচিত তার জবানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং এমন কথা বলা যা মানুষের মধ্যে শান্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

سورة الحجرات - آيت ١١
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

অর্থ:

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরকে উপহাস করো না। হতে পারে যাকে তোমরা উপহাস করছো, সে তোমাদের চেয়ে উত্তম। এবং নারীদের মধ্যেও কেউ অন্য নারীদের উপহাস করবে না। হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম। এবং তোমরা একে অপরকে দোষ দিও না এবং অপমানসূচক উপাধি দিও না। ঈমানের পরে পাপী নাম দেওয়া কতই না খারাপ! আর যারা তাওবা করবে না, তারাই তো যালিম।" সূরা হুজুরাত (৪৯:১১)

আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
"একজন মুসলিমের ওপর আরেকজন মুসলিমের সম্মান, সম্পদ এবং রক্ত হারাম। কারো প্রতি অন্যায় করা, তাকে গালি দেওয়া এবং তার মানহানি করা বড় গুনাহ।"
(সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৬৪)

زباں سے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

অর্থ:
"তোমার জবান যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তাতেই কি সব শেষ?
তোমার হৃদয় আর দৃষ্টি যদি মুসলমান না হয়, তবে কিছুই নয়।"

আল কাউসার

নফস

এই আলোচনা শুরু করা যাক একটি হাদিস দিয়ে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ

'দেখো! মানুষের শরীরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি তা ঠিক থাকে তাহলে মানুষের গোটা শরীরটাই ঠিক থাকে। আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানুষের গোটা শরীরটাই বিনষ্ট হয়ে যায়। আর স্মরণ রেখো, তা হলো হৃৎপিণ্ড বা অন্তর।' [মিশকাত: ১/২৪১]

অপর দিকে কুরআন মাজীদে নফ্সকে তিনটি সিফাত বা বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো:

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة (নফসে মুৎমায়িন্নাহ) : প্রশান্ত ও স্থির মন।
النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ (লাউওমাহ) : আত্মসমালোচক মন।
النَّفْسُ الأَمَارَة (নফসে আম্মারা) : মন্দ কাজে আদেশকারী মন।

তবে এই সকল প্রকার ক্বলবকে হাদীসে চার প্রকার ক্বলবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

،عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ " :الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ :قَلْبُ مُصَفَحُ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ ,وَقَلْبُ أَغْلَفُ فَذَلِكَ قَلْبُ الْكَافِرِ وَقَلْبُ أَجْرَدُ فَكَأَنَّ فِيهِ سِرَاجًا يُزْهِرُ فَذَاكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ,وَقَلْبُ فِيهِ نِفَاقٌ وَإِيمَانٌ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ قُرْحٍ يَمُدُّهَا فَيْحٌ وَدَمٌ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَسْقِيهَا مَاءٌ طَيِّبٌ فَإِنَّ مَا غَلَبَ غَلَبَ عَلَيْهِ.

'হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন কলব চার প্রকার ১. বিকৃত কলব: আর এটা হলো মুনাফিকদের কলব ২. পর্দাবৃত কলব: এটা কাফেরদের কলব ৩. মুক্ত কলব: সব ধরনের ভ্রান্ত আক্বিদাহ ও পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত কলব যেন তার মধ্যে একটি উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে আর এটা হচ্ছে মুমিনদের কলব ৪. নিফাক ও ঈমানযুক্ত কূলব: যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন ফোড়ার মতো যার ভিতরে পুঁজও রয়েছে আবার রক্তও রয়েছে অথবা তার দৃষ্টান্ত হলো এমন একটি গাছ, যাকে নষ্ট পানি দ্বারা ও বিশুদ্ধ পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়। অতঃপর যে পানির শক্তি বেশী সে পানি অনুযায়ী গাছটি গণ্য হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৭ম খন্ড ৪৮১ পৃষ্টা; মুসনাদে আহমদ ১১১২৯)

এ হাদীসে ক্বলবকে চার ভাগে করা হয়েছে।
قَلْبُ المُنَا فِق মুনাফিকের ক্বলব
قلب الكافر কাফেরের ক্বলব
قَلْبُ المُؤْمِن মুমিনের ক্বলব
قلب فيه نفاق وايمان ঈমান ও নিফাক মিশ্রিত ক্বলব

প্রথম প্রকার: الْقَلْبُ الْمَرِيضُ রুগ্ন ক্বলব বা قَلْبُ الْمُنَافِقِ মুনাফিকের ক্বলব। এই প্রকার ক্বলবের অন্তর্ভুক্ত ক্বলব হলো الْقَلْبُ الْمَرِيضُ রোগাক্রান্ত ক্বলব ও الْقَلْبُ الزَّائِغُ বক্র ক্বলব।

পবিত্র কুরআনে ইরশদ হয়েছে:

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ

যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলছিল, 'এদেরকে এদের ধর্ম ধোকায় ফেলেছে।' (সূরা আনফাল ৮:৪৯)

এ আয়াতে মুনাফিক ও রোগাক্রান্ত ক্বলবের অধিকারী লোকদের একই সারিতে দাড় করানো হয়েছে। অবশ্য সকল রোগাক্রান্ত ক্বলবের অধিকারীকে মুনাফিক বলা যায়না। কেননা রোগ যেমন বাড়ে কমে এবং খুব দ্রুত পরিবর্তণ হয়। রোগাক্রান্ত কূলবও তেমন দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন হয়।
এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন।(সূরা বাকারা ২:১০)

এরা যদিও মুমিন দাবী করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুমিন নয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ)٨ (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে (বলে মনে করে)। অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না।' (সূরা বাকারা ২:৮-৯)

এ প্রকার লোকগুলো প্রকাশ্য কাফেরের চেয়েও মারাত্মক। কেননা যারা প্রকাশ্য কাফের তার ভিতরে-বাইরে প্রকাশ্য কাফের হওয়ায় তাদের চিনতে অসুবিধা হয় না। তারা মুমিনদের ধোঁকা দিতে পারে না। কিন্তু মুনাফিকরা যেহেতু বাহ্যিকভাবে নিজেদের মুমিন দাবী করে অথচ ভিতরে

তারা কাফের সেহেতু সাধারণ মুমিনদের তাদের পক্ষে ধোঁকা দেয়া খুবই সহজ। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে এদের শাস্তি প্রকাশ্য কাফেরের চেয়েও বেশী বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

'নিঃসন্দেহ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে মুনাফিকরা অবস্থান করবে। (সূরা নিসা ৪:১৪৫)

এই প্রকার ক্বলবের অধিকারী লোকদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ক. এরা দুমুখো আচরণ করে। মুমিনদের সঙ্গে একরকম আবার কাফের- মুশরিকদের সঙ্গে অন্য রকম।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

'আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি, এবং যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী।' (সূরা বাকারা ২: ১৪)

খ.এরা সব-সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

'সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, 'আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে। অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে।' (সূরা মায়িদা ৫:৫২)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

أَبِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

তাদের অন্তরে কি ব্যাধি রয়েছে? নাকি তারা সন্দেহ পোষণ করে, না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের উপর যুলুম করবেন? বরং তারাই তো যালিম।' (সূরা নূর ২৪:৫০)

গ. এরা নারীলোভী হয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَانِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

'হে নবী-পত্নিগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে। (সূরা আহযাব ৩৩:৩২)

ঘ. এরা চাটুকার, বাকপটু ও ঝগড়াটে হয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

'আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে অবাক করে এবং সে তার অন্তরে যা রয়েছে, তার উপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। আর সে কঠিন ঝগড়াকারী। (সূরা বাকারা ২:২০৪)

ঙ. এরা মিথ্যা অপপ্রচারে পারদর্শী হয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا)٦٠ (مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا)٦١ (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا)٦٢(

'যদি মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ও শহরে মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরা বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে ক্ষমতাবান করে দেব। অতঃপর তারা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হয়ে অল্প সময়েই থাকবে। অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, পাকড়াও করা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। ইতিপূর্বে যারা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি, আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কখনোই কোন পরিবর্তন পাবে না। (সূরা আহযাব ৩৩:৬০-৬২)

চ. এরা মুমিনদের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

'আর যখনই কোন সূরা নাযিল করা হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এটি তোমদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল,? অতএব যারা মুমিন নিশ্চয় তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এটি তাদের অপবিত্রতার সাথে অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে এবং তারা মারা যায় কাফির অবস্থায়।'(সূরা তাওবা ৯:১২৪-১২৫)

এ আয়াতে বর্ণিত মুনাফিকদের কথা 'এটি তোমদের কার ঈমান বৃদ্ধি করলো? তুচ্ছ ও কটাক্ষমূলক বলেছে।

ছ. এরা কুরআনের বিভিন্ন উপমা ও কিচ্ছা-কাহিনী নিয়ে কটাক্ষ করে। তারা বলে মশা-মাছি, মাকড়শা ইত্যাদির মাধ্যমে কেন আল্লাহ সুবহানাহু উপমা পেশ করছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا
هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

'আর যেন যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং কাফেররা বলে, এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ কী ইচ্ছা করেছেন? এভাবেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে

পরিচালিত করেন। আর তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। আর এ হচ্ছে মানুষের জন্য উপদেশমাত্র।'
(সূরা মুদ্দাসির ৭৪:৩১)

জ. এরা অতি উৎসাহী হয়। রুগ্ন ক্বলবের অধিকারী লোকেরা বিভিন্ন কাজে অতি উৎসাহী হয়, কেনো জিহাদের হুকুম দেওয়া হচ্ছে না? কেন অমুককে হত্যা করা হচ্ছে না? জিহাদের বক্তব্য আর কত দিন শুনবো? এখন মাঠে নামার সময়। অথচ প্রয়োজনের সময় এদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তারা ভয়ে মোবাইল নাম্বার বন্ধ করে রাখে, মারকাজে আসা ছেড়ে দেয়, ভয়ে কাচুমাচু হয়ে বিবি-বাচ্চাদের নিয়ে ঘরের অন্ধকার কুঠুরিতে আশ্রয় নেয়। সেখানে বসেও চিন্তা করে পুলিশ আসলো কিনা, কোন লোক দেখলে মনে করে এ লোকটি গোয়েন্দা কিনা। রুগ্ন ক্বলবের অধিকারী লোকদের এই চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করে

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ

'আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, কেন একটি সূরা নাযিল করা হয়নি? অতঃপর যখন দ্ব্যর্থহীন কোন সুস্পষ্ট সূরা নাযিল হয় এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা তোমার দিকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য।'(সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২০)

ঝ. এরা মুমিনদের উপর কোনো বিপদাপদ আসলে সেটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

'আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, 'আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আহযাব ৩৩:১২)

এ আয়াতে দেখা গেলো তারা আল্লাহর ওয়াদাকে প্রতারণা বলে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

ঞ. এরা বক্র মনের অধিকারী হয়। সবসময় চেষ্টা করে কিভাবে কুরআন -হাদীসের ভুল বের করা যায় অথবা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

'যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।'(সূরা আল ইমরান ৩:৭)

এছাড়া হাদীসে এদের কিছু লক্ষণ বলা হয়েছে। যা মুনাফিক অধ্যায়ে আলোচনা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

দ্বিতীয় প্রকার: আল ক্বালবুস সালীম الْقَلْبُ السَّلِيمُ বা ক্বলবুল মুমিন قَلْبُ الْمُؤْمِنُ

'আল ক্বালবুস সালীম, মানে হচ্ছে সুস্থ, সঠিক ও বিশুদ্ধ ক্বলব। যার মধ্যে পাপ-পঙ্কিলতার কোন কালো দাগ নেই। যেন তার মধ্যে একটি উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে আর এটা হচ্ছে মুমিনদের কলব। কোন প্রকার রোগ তাকে আক্রান্ত করেনি। কোন জীবাণু তার মধ্যে প্রবেশ করেনি।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

'সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তরসহ।'(সূরা শুআরা ২৬:৮৮-৮৯)

এ আয়াতে সুস্থ ক্বলব পাপ পঙ্কিলতার ময়লা ও শিরকমুক্ত ক্বলব উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই প্রকার ক্বলবকেই الْقَلْبُ الصحيح সুস্থ ক্বলব নামেও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبْ اَلْقَلْبُ السَّلِيمِ :هُوَ القَلْبُ الصَّحِيحِ هُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ لَانَّ قَلْبَ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ مَرِيضٌ .قَالَ اللَّهِ :فِي قُلُوْبِهِم مَرَضٌ

সাইদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) বলেন, ক্বলবে সালীম হলো, সুস্থ ক্বলব। আর তা হচ্ছে, মুমিনদের ক্বলব। কেননা কাফের ও মুনাফিকদের ক্বলবকে পবিত্র কুরআনে রুগ্ন ক্বলব হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

ক্বলবে সালীমের সমার্থক আরো দুটি নাম রয়েছে। একটি হলো: اَلْقَلْبُ المنيب 'আল কালবুল মুনীব'।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ

'যে না দেখেই রহমানকে ভয় করত এবং বিনীত হৃদয়ে উপস্থিত হত।'(সূরা কাফ ৫০:৩৩)

তৃতীয় প্রকার: আলক্বলবুল মাখতুম
قلب الكافر কাফেরের অন্তর

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কূলবসমূহের আরেকটি প্রকার হলো 'আল ক্বালবুল মাখতুম, বা সিলগালাকৃত ক্বলব। মানুষ গুনাহের কাজ করতে করতে একসময় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন তার কাছে কোন ভালো-মন্দ পার্থক্য থাকে না। কুরআন-সুন্নাহর কথা তার ভালো লাগে না। সব সময় পাপাচার ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতে ভালো লাগে। এ পর্যায়ে যখন উপনীত হয় তখন ঐ ক্বলবকে أَلْقَلْبُ الْمَخْتُوْمُ সীলগালাকৃত ক্বলব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ

'আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। (সূরা বাকার ২:৭)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন বিধায় তারা অন্যায়

করছে, বরং তারা অন্যায় করতে করতে এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যখন তাদের আর কোনো হেদায়েত লাভ করার সুযোগ অবশিষ্ট নেই। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

هُم بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ

'অতঃপর আমি তার পরে অনেক রাসূলকে তাদের কওমের নিকট পাঠিয়েছি এবং তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা ইতিপূর্বে অস্বীকার করার কারণে ঈমান আনার ছিল না। এমনিভাবে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তরে মোহর এটে দেই। (সূরা ইউনুস ১০:৭৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে;

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الْكَافِرِينَ

'এ হল সে সব জনপদ, যার কিছু কাহিনী আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। আর তাদের কাছে তো স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলো। কিন্তু যা তারা পূর্বে অস্বীকার করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিল না। এমনিভাবে আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।'(সূরা আরাফ ৭:১০১)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে;

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহর ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণিত। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরে সীল মেরে দেন।(সূরা গাফির ৪০:৩৫)

এ পর্যায়ে যারা উপনীত হয় তারা সত্যকে সত্যরূপে দেখে না, সত্য কথা শুনে না, সত্যকে বোঝার চেষ্টাও করে না। এদেরকে পবিত্র কুরআনে পশুতুল্য বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে;

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

'আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের রয়েছে অন্তর, তার দ্বারা তা বুঝে না, তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না, এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।(সূরা আরাফ ৭:১৭৯)

এরা মূলত আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে নিজের মনের পূজা করে, তাদের নফসকে তারা অনুসরণ করে এবং নিজেদের নফসকেই তারা ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। একারনেই তাদের অন্তরকে সীলগালা করে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

তবে তুমি কি তাকে লক্ষ করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।'(সূরা জাসিয়াত ৪৭:২৩)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে মোহর লাগানোর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহর বিধান জানার পরেও নিজের নফসকে ইলাহ বানিয়ে নেয়া। একই ধরনের আরো একটি কারণ অন্য আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

'আর তাদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে, যারা তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শুনে। অবশেষে যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তারা যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, 'এই মাত্র সে কী বলল? এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে।(সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৬)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

'এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল।(সূরা নাহাল ১৬:১০৮)

চতুর্থ প্রকার: قلب فيه إيمان ونفاق ঈমান ও নিপাত মিশ্রিত ক্বলব

অমনোযোগী বা উদাসীন ক্বলব। এদের কাছে আল্লাহর বিধানের কোন গুরুত্ব থাকে না। এ ধরনের লোকদের ক্বলব ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় এরা মাঝে মাঝে নেক আমল করে আবার মাঝে মধ্যে গুনাহ করে। কখনো তাওবা করে। এ প্রকার মানুষের সংখ্যাই বেশী। একজন মানুষ যে মাঝে মধ্যে পাপ করে আবার আল্লাহর নিকটে তাওবা করে সে নিজের পরিচয় কুরআন থেকে খুজে বের করার চেষ্টা করলো, কেননা সে জানে কুরআনের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের আলোচনা রয়েছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (সূরা আম্বিয়া ২১:১০)

এ আয়াতের সূত্র ধরে পবিত্র কুরআনের ভিতরে নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করলো। এক সময় ঠিকই সে নিজেকে পবিত্র কুরআনের ভিতর আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো। সে পেয়ে গেলো

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত-

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'আর অন্য কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, সৎকর্মের সঙ্গে তারা অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'(সূরা তাওবা ৯:১০২)

লোকটি এ আয়াত পেয়ে খুশি হলো। আর বললো, বাহ। বাহ! পেয়েছি। আমি আমাকে পবিত্র কুরআনের ভিতর পেয়েছি। সত্যিইতো। আমি অপরাধ স্বীকার করি, মাঝেমধ্যে নেক আমলের সাথে পাপকাজ করি। এই প্রকার লোকদের মধ্য থেকে যারা তাওবা করে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের তাওবা কবুল করে নেন। যা উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। আর যদি তাওবা না করে বরং একের-পর এক গুনাহ করতে থাকে তাহলে একপর্যায়ে তাদের ক্বলবالْقَلْبُ الْقا سي শক্ত ক্বলবে রূপান্ততি হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالحَصِيرِ عُودًا عُودا. فَأَيَ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيَ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مثْل الصَّفَا فَلَا تَضُرَّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ .وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَنِّيَا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

'মানুষের অন্তরে অবিরত একটির পর একটি ফিতনা আসতে থাকবে, যেভাবে চাটাই বুনার সময় এ পাতাগুলো একাধারে আসতে থাকে। ফলে যে অন্তর তা গ্রহণ করবে তার মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর তা গ্রহণ করবে না তার মধ্যে একটি সাদা দাগ পড়ে যাবে। অবশেষে অন্তর দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি হবে মর্মর পাথরের মতো স্বচ্ছ ও সাদা। আসমান ও জমিন যতদিন টিকে থাকবে কোনো প্রকারের ফিৎনাই তা ক্ষতি করতে পারবে না। আর কালো দাগ পড়া অন্তরটি হবে উপুর হওয়া কলসির মতো। ভালোকে ভাল হিসেবে এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে তারতম্য করার যোগ্যতা তার থাকবে না। ফলে যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করবে। (মুসলিম, ৩৮৬)

হিংসা

حسد ''کہتے ہیں کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اُس سے"
یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک ایسی باطنی اور روحانی
بیماری ہے جو انسان کے سینے میں کینہ، بغض اور کھوٹ کا بیج بودیتی ہے، جس سے
انسان کے تمام نیک اعمال تلف ہوجاتے ہیں، اور اُس سے اعمالِ صالحہ کی توفیق اللہ تعالیٰ
چھین لیتے ہیں۔

হাসান বলা হয়, যে কারো কাছে আল্লাহর কোন নেয়ামত দেখে এমন সংকল্প করা যে তার এই নেয়ামত যেন শেষ হয়ে যায়, যদি তা আমি পাই বা না পাইও। এটা এমন এক অদৃশ্য এবং অন্তরের রোগ যা মানুষের অন্তরে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। অন্যের প্রতি বিদ্বেষ এবং ঘৃণার বীজ সৃষ্টি করে। যার ফলে মানুষের সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায় এবং আরো ভয়ংকর বিষয় আল্লাহ তার থেকে আমলে ছলেহ করার তৌফিক ছিনিয়ে নেন।

:اور ایک روایت میں آیا ہے کہ
حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے۔)''سنن ابی داؤد،ج :۴، ص:۲۷۶("

এক বর্ণনায় আছে, হিংসা নেককারদের নূর নিভিয়ে দেয়।

অহংকার

تکبر کہتے ہیں :اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا

অহংকার বলা হয়, নিজেকে বড় ভাবা এবং অন্যকে ছোট ভাবা।

تکبر نہایت مذموم اور بری صفت ہے ، احادیث میں تکبر پر سخت وعیدیں اور مذمتیں وارد ہوئی ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :جو تکبر کرتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ومعمولی ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنی نظر میں بڑا ہو؛ بلکہ ایسا شخص لوگوں کی نظروں میں کتا یا خنزیر بھی سے زیادہ ذلیل اور معمولی ہوجاتا ہے (مشکوۃ شریف، ص :۴۳۴، مطبوعہ :مکتبہ اشرفیہ دیوبند، بہ حوالہ :شعب الایمان للبیہقی)

অহংকার নিতান্তই অপরাধ এবং খারাপ গুণ। হাদিসে অহংকার সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে অহংকার করে, সে মানুষদের কাছে অপমানিত এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের শিকার হয়, যদিও সে নিজের দৃষ্টিতে অনেক বড়। বরং, এমন ব্যক্তিরা তো মানুষের নিকট কুকুর শুকুর থেকেও নিকৃষ্ট প্রমাণিত হয়।

বখিলি বা কৃপণতা

বখিলি বা কৃপণতা অন্তরেরের এক শক্ত ব্যাধি। এ ব্যাধি থেকে মুক্তির পন্থা হচ্ছে পার্থিব মালের মহব্বত কমানো। সব গোনাহর মূল হলো মাল বা দুনিয়ার মহব্বত। আল্লামা দামিরি রাহিমাহুল্লাহর মতে কৃপণতা তিন প্রকার-

(১) নিজের প্রয়োজনেও মাল তেমন খরচ করতে চায় না; যেখানে খরচ না করলেই নয়, সেখানে কিছু করে। পরিবার ও সন্তানাদির জন্য খরচ করে না। অপরের বেলায় তো প্রশ্নই আসে না।

(২) নিজের জরুরি প্রয়োজনেও খরচ করতে অনীহা। মাল সঞ্চয় করাটাই শুধু লক্ষ্য। পরিবার ও অন্যের বেলায় তো প্রশ্নই আসে না।

(৩) নিজে তো কারো জন্য খরচ করেই না, বরং অন্য কেউ যদি দান-খয়রাত করতে চায়, তাতেও তার কষ্ট হয়। অসহ্য হয়ে দান করতে নিষেধ করে দেয়। আল্লাহ পাক বখিলকে কোনোক্রমেই পছন্দ করতে পারেন না। বখিলের বিপরীতে হলো 'ছখি'। ছখি শব্দের অর্থ হলো

দানশীল। দানের অনেক ফযিলত আছে। আল্লাহ তাআলার নারাজিকে মিটিয়ে দেয় দান-খয়রাত।

দুনিয়ার প্রতি লোভ লালসা

পৃথিবীতে মানুষ মানুষে বিভেদ, ঝগড়া, ফাসাদ, কাটা-কাটি, মারামারিসহ যত ধরনের

অপরাধমূলক কাজ হয়ে থাকে, সব কিছুর মূলে হলো দুনিয়ার লোভ। এমন কোনো

মানুষ নেই, যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকে না। এর প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের আয়াত। আল্লাহ পাক বলেছেন-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَابِ

মানবকূলের কাছে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশুরাজি এবং খেত খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু।'

এই আয়াতে ছয়টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষকে আকৃষ্ট করে। প্রত্যেকটাই হলো দুনিয়ার ভোগ্য সামগ্রী। আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন, দুনিয়ার এ জিনিসগুলোর মহব্বত মানুষকে ঘিরে রেখেছে। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, সবার অন্তরেই দুনিয়ার মহব্বত আছে। সুতরাং কেউ যদি বলে, আমার অন্তরে দুনিয়ার আকর্ষণ নেই, তাহলে নিশ্চিত সে হয়ত মিথ্যে বলছে অথবা উন্মাদ হয়ে গেছে। কারণ, মানুষ হলে তার মাঝে এগুলোর মহব্বত থাকবেই, নতুবা কুরআনের আয়াত ঠিক হবে না। দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে থাকাটা নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তার মধ্যে ডুবে থাকাটা নিন্দনীয়। (সূরা আলে ইমরান : ১৪)

নিফাক বা ডাবল স্টান্ডার্ডবাজি

নিফাক তথা মুনাফেকিও আত্মিক একটা ব্যাধি। এটা সাধারণ ব্যাধি নয়; বরং অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। যে ব্যক্তি নিফাকির মধ্যে লিপ্ত, তাকে বলে মুনাফিক। মুনাফিক দুই প্রকার-

(১) ইতেকাদি মুনাফিক বা বিশ্বাসঘাতক।

(২) আমলি মুনাফিক বা কার্যত মুনাফিক।

ইতেকাদি মুনাফিক বা বিশ্বাসঘাতক: ইতেকাদি মুনাফিক ব্যক্তির নিফাকের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও নবী আলাইহিস সালামের রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাবি করে, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস রাখে না; বরং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে গোপনে স্বচেষ্ট থাকে। এ শ্রেণির মুনাফিক কাফের সম্প্রদায় থেকেও মারাত্মক ক্ষতিকর। এদের দ্বারাই যুগে যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। কারণ, কাফেররা প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তার বাণীকে অস্বীকার করে, মুসলমানদেরকে শত্রু মনে করে। তাই মুসলমান তাদের কাছে যায় না। তাদের দুশমনি ও যড়যন্ত্র থেকে বেঁচে থাকে। পক্ষান্তরে মুনাফিক গোষ্ঠী মুখে ইসলামের দাবি করে থাকে, তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে ইসলাম ও মুসলমানদের তথ্য সংগ্রহ করে কাফের গোষ্ঠীর হাতে দিয়ে ইসলামের ক্ষতি সাধনে তৎপর থাকে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলমান নামক সত্তাকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেয়া। তাই সব সময় তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে ইসলামের ক্ষতি করেছে। পবিত্র কুরআনে তদের ষড়যন্ত্র ও কপটতার বিশদ বর্ণনা এসেছে। তাদের শাস্তি হবে দৃষ্টান্তমূলক। কাফের থেকেও মারাত্মক। পবিত্র কুরআনে তাদের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

'নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নামের নিম্নস্তরে।' (সূরা নিসা:১৪৫)

আমলি মুনাফিক বা কার্যত মুনাফিক: আমলি মুনাফিক ব্যক্তির নিফাকের সম্পর্ক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ পাকের বিশ্বাস আছে, মুখেও স্বীকার করে, কিন্তু কাজে পরিণত করে না। এদেরও শাস্তি হবে, তবে তুলনামূলক কম।

প্রথম শ্রেণির মুনাফিক কারা তা কেবলমাত্র ওহির মাধ্যমে জানা যায়। সুতরাং নবী আলাইহিস সালামের ইনতিকালের পর থেকে এই শ্রেণির মুনাফিক কারা, তা জানা যায় না। নবী

আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক মুনাফিকের সংখ্যা ওহির মাধ্যমে জানিয়ে ছিলেন। এ রহস্য তিনি সাহাবাদের কাউকে জানাতেন না, কেবল হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমস্ত রহস্য জানাতেন। এ কারণে তাকে 'সিররুন নবী' বলা হতো। তিনিও মুনাফিকদের সংখ্যা জানতেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি সরাসরি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত, তিনি বারবার হুযাইফার কাছে মুনাফিকদের পরিচয় জানতে চাইতেন; কিন্তু নবীর নিষেধ থাকায় তিনি তা প্রকাশ করেননি। একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, মুনাফিক কারা সেটা আমি জানতে চাই না, তবে সেখানে আমার নাম আছে কি না-তা বলে আমাকে একটু শান্ত করো! উত্তরে তিনি বললেন, আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের অবস্থা যাচাই করা দরকার। কারণ, প্রতি যুগেই এই শ্রেণির মুনাফিকের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমান যুগও তা থেকে মুক্ত নয়। তবে নিশ্চিতভাবে কাউকে বলা যাবে না। কারণ, এর সম্পর্ক অন্তরের সাথে।

মুনাফিকের আলামত

বিভিন্ন হাদিসে মুনাফিকের আলামত বলা হয়েছে চারটি-

(১) কথা বলার সময় মিথ্যে বলে।

(২) অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে।

(৩) আমানত রাখলে খিয়ানত করে।

(৪) বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হলে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে।

কারো মাঝে এ চারটি নিদর্শন বিদ্যমান থাকলেই তাকে প্রথম প্রকার মুনাফিক বা ইতেকাদি মুনাফিক বলা যাবে না। কারণ, অন্তরের খবর জানার সাধ্য শুধু আল্লাহ পাকের। তবে উপর্যুক্ত চারটি আলামত কারোর মধ্যে প্রকাশ পেলে সে দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিক বলে গণ্য হবে। চারটি আলামত হুবহু না থাকলেও সে আংশিক মুনাফিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

দুনিয়ার মহব্বত

দুনিয়া হচ্ছে ধোঁকার উপাদান। এটাই দুনিয়ার হাকিকত। দুনিয়া শব্দটা دناءة (দানাআতুন) থেকে নির্গত অথবা دنو (দুনুউউন) থেকে নির্গত। উভয় দিক থেকেই খারাপ অর্থ প্রদান করে। যদি دناءة থেকে হয় তাহলে তার অর্থ হলো হীন বা নিকৃষ্ট। কারণ, সে মানুষকে হীন বা নিকৃষ্ট বানিয়ে ছাড়ে। আর যদি دنو থেকে নির্গত হয় তাহলে অর্থ হবে নিকটে। কারণ, সে আখেরাতের অতি নিকটে।

দুনিয়া ধোঁকার উপাদান-কথাটা আসলে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিষয়টা স্পষ্ট করতে একটি উদাহরণ পেশ করা যায়। প্রত্যেক বস্তুরই নিজস্ব একটা ছায়া থাকে। ছায়াকে ধরার জন্য যদি কেউ তার পিছে দৌঁড়ায়, তাহলে কস্মিনকালেও সে ছায়ার নাগাল পাবে না। ছায়া তার থেকে সর্বদা এগিয়েই থাকবে। পক্ষান্তরে ছায়াকে পিছনে রেখে যদি আগে আগে চলে, তাহলে ছায়াই আবার তার পিছু নেবে। দুনিয়ার দৃষ্টান্তও এমনই। কেউ যদি তাকে ধরতে চায়, তাহলে শুধু লেজ দেখিয়ে সামনে দৌঁড়ায়, ধরা দেয় না। পক্ষান্তরে দুনিয়াকে কেউ যদি উপেক্ষা করে, তাহলে দুনিয়াই তাকে খুঁজে বেড়ায়। এ ব্যাপারে একটি সুন্দর ঘটনা মনে পড়ে গেল-

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত বড় বুজুর্গ আলেমে দ্বীন। একদিন তার এক মুরিদ বড় অংকের অর্থ নানুতবি রাহিমাহুল্লাহকে হাদিয়া দেয়ার জন্যে নিয়ে আসে। এ মোটা অংকের হাদিয়া দিয়ে নানুতবি রাহিমাহুল্লাহকে হাত করাই ছিল সেই মুরিদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বুজুর্গদের দৃষ্টি থেকে কোনো কিছু এড়ায় না। মুরিদের পৌঁছার আগেই তার কাশফ হয়ে গেল।

মুরিদ এসে প্রথমে নানুতবি রাহিমাহুল্লাহকে সালাম দিলে তিনি মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। মুরিদ আবার ওই দিকে ঘুরে সালাম দিল। এবারো কোনো উত্তর মিলল না। এভাবেই কয়েকবার সালাম দেয়া হলে অবশেষে নানুতবি রাহিমাহুল্লাহ উত্তর দিলেন। মুরিদ বিনয়ের সাথেই বলল, হুজুর, এগুলো আপনার জন্য হাদিয়া। নানুতবী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আমার কোনো হাদিয়ার প্রয়োজন নেই। মুরিদ বলল, আপনার যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে আপনার মাদরাসার জন্য রেখে দিন। নানুতবি রাহিমাহুল্লাহ উত্তর দিলেন, না, আমার মাদরাসারও প্রয়োজন নেই। মুরিদ বলল, আপনার মাদরাসায় তো অনেক গরিব ছাত্র আছে, তাদের মাঝে বণ্টন করে দিলে ভালো হয়। নানুতবি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আমি দিতে পারব না, তোমার টাকা তুমিই বণ্টন করে দিয়ে যাও। এই হাদিয়া দিয়ে আমাকে হাত করতে চাও?

মুরিদের পার্থিব অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য যে নানুতবি রাহিমাহুল্লাহর কাছে গোপন নেই- এটা আর বুঝতে কষ্ট হলো না। তাই মুরিদ এবার অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে টাকার থলেটা নানুতবি রাহিমাহুল্লাহর জুতার ভেতর রেখে চলে গেল। জুতার ভেতর টাকার থলে দেখে নানুতবি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আমরা দুনিয়ার পিছনে ঘুরি না, দুনিয়াই আমাদের জুতার পেছনে ঘোরে।

উদাসীন হওয়া

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো উদাসীনতা। এটি একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের কারণে মানুষ ধীরে ধীরে গুনাহের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তবে আল্লাহ সুবহানাহু নিজ অনুগ্রহে যাদের রক্ষা করেন তারা ব্যতীত।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

'অবশ্যই তুমি এ দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, অতএব আমি তোমার পর্দা তোমার থেকে উন্মোচন করে দিলাম। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি খুব প্রখর।'(সূরা কাফ : ৫০:২২)

ইখলাস বিহীন আমলের পরিণাম

ইখলাসহীন আমলে অশান্তি বৈ কিছু নেই। মনে অস্থিরতা, অশান্তি লেগেই থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলি, কেউ শিক্ষকতার চাকুরিতে যোগ দিলো। উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ উপার্জন। তাহলে এমন লোকের মধ্যে সব সময় মানসিক অস্থিরতা বিরাজ করবে এবং মনে মনে সে সুযোগ খুঁজতে থাকবে যে, অন্যত্র কোথাও এর চেয়ে বেশি বেতনের চাকরির সন্ধান পেলে সেখানেই চলে যাবে। কারণ, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা। সামান্য কিছু বেশি টাকার জন্য সে চাকুরি ছেড়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

পক্ষান্তরে যদি তার অন্তরে খুলুসিয়ত বা একনিষ্ঠতা থাকে, টাকা পয়সার মোহ না থাকে, চাকুরির উদ্দেশ্য হয় অভিজ্ঞতা অর্জন ও দ্বীনি তালিমের সওয়াব অর্জন, তাহলে সে প্রফুল্ল চিত্তে কাজ করে যাবে, অন্তরে কোনো রকম অস্থিরতা থাকবে না। এরপরেও যদি তাকে কিছু টাকা পয়সা বাড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে যতটুকুই দেয়া হোক তাতেই সে তুষ্ট থাকবে। এরকম একনিষ্ঠতার কারণে আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, চাকুরির ক্ষেত্রেও সে হবে সম্মানিত। এসব তো এ কারণেই হয়েছে যে, তার নিয়ত সঠিক ছিল। উদ্দেশ্য ছিল সৎ এবং

স্বচ্ছ। এই আলোচনার সাথে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি রাহিমাহুল্লাহর একটি ঘটনা চমৎকার মিলে যায়।

مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنے خطا سے
تقدیر بدل جاتی ہیں مضطر دل کی دعا سے

'পাপী-তাপী বান্দা সকল নিরাশ না হয় অনন্যোপায় হৃদয়ের দোয়ায় তকদিরও বদলায়।

একটি ঘটনা দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করছি।

অপদৃষ্টির কবলে এক বুজুর্গের হালত

অপদৃষ্টির মতো একটামাত্র গোনাহই বুজুর্গি ও বেলায়েতের গগনচুম্বি মাকাম ও সম্মান থেকে মাটিতে নামিয়ে দিতে পারে। পথিবীর ইতিহাসে এরকম ঘটনা বিরল নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলুসি ও হামিদুল্লাহ আল খায়েরের প্রসিদ্ধ ঘটনা স্মরণযোগ্য।

আবু আব্দুলুল্লাহ উন্দুলুসি অধিকাংশ ইরাকবাসীদের পীর ও উস্তাদ ছিলেন। তিনি ছিলেন হাদিস ও তাফসিরের ইমাম। ত্রিশ হাজার হাদিস তাব মুখস্থ ছিল। একবার তিনি হজের সফরে বের হয়েছিলেন। সাথে মুরিদরাও ছিল। বিশিষ্ট মুরিদ হযরত আল্লামা শিবলী রাহিমাহুল্লাহও সাথে ছিলেন।

আল্লামা শিবলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের বিশাল কাফেলা খুব শান্তভাবেই গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। পথিমধ্যে এক জায়গায় খ্রিষ্টানদের বসতি ছিল। সেখানে পৌঁছলে নামাযের সময় হয়, কিন্তু পানির অভাবে নামায বিলম্ব হচ্ছিল। পানির সন্ধানে খ্রিষ্টানদের বসতির মধ্যে ঢুকলাম। দেখলাম একটা কূপ, তা থেকে কিছু খ্রিষ্টান মেয়ে পানি তুলছিল। তার মধ্যে একটি মেয়ের রূপ অত্যন্ত মনোহরী। পীর

সাহেবের দৃষ্টি ওই মেয়ের দিকে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল অঘটনটা।

পীর সাহেব ওই যুবতীর প্রতি যারপরনাই আসক্ত হয়ে পড়েন। পরের দিন তাকে আবার দেখার ইচ্ছা করলেন। শুরু হলো কূপের পাশে বসে অপেক্ষার পালা। তিনি সেখানে বসে পড়েন। সময় হলে নামায পড়তেন আর চুপচাপ বসে থাকতেন। মুরিদরা তো সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হয়। , তৃতীয় দিন আমি পীর সাহেবের নিকট গিয়ে

হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন বললাম, হযরত। ছাত্র-মুরিদ সকলেই আপনার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করছে। আপনার কী হয়েছে বলুন! তিনি বললেন, 'হে ভক্তবৃন্দ! আমি আর কত দিন গোপন রাখবো এ বিষয়। এরপর মনের কথা সব খুলে বলার পর বললেন, আমার দ্বারা মোটেই সম্ভব হচ্ছে না এ ভূমি ছেড়ে যাওয়া।

শিবলী বাহিমাহুল্লাহ বলেন, এরপর আমরা বললাম যে, আপনি আমাদের পথের দিশারী! আপনি আমাদেরকে অপমানিত করবেন না! দেশের লোক আমাদের জন্য অপেক্ষমান। পীর সাহেব বললেন, হে আমার শিষ্যবৃন্দ! আমার থেকে বেলায়েত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তাই আমার অপেক্ষায় আর তোমরা থেকো না। তোমরা তোমাদের রাস্তা দেখো।

শিবলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ কথা শোনার পর আমরা সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। অগত্যা পীর সাহেবকে রেখে আমরা স্বদেশ বাগদাদের দিকে চললাম। দেশে ফেরার সংবাদ পেয়ে অনেক লোক আমাদের দেখার জন্য আসে। কিন্তু পীর সাহেবকে না দেখে এবং তার ঘটনা শুনে তারা কাঁদতে লাগে। সবাই আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে বললো, 'হে আল্লাহ! আমাদের পীর সাহেবকে পূর্বের মতো করে দিন, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে আবারও বেলায়েতের তাজ পরিয়ে দিন। এভাবে একটি বছর কেটে গেল।

শিবলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা এক বছর পর কয়েক জন সাথী গেলাম পীর সাহেবের সন্ধানে। সেখানে পৌঁছে গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করলাম তার অবস্থান সম্পর্কে। তারা বলল, আপনাদের পীর অমুক সরদারের মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সরদার শুকর চরানোর শর্তে তা মেনে নেয়। গিয়ে দেখুন অমুক জঙ্গলে তিনি শুকর চরাচ্ছেন।

এ কথা শুনে সবাই চিৎকার দিয়ে উঠলেন, দ্রুত ছুটে গেলেন জঙ্গলে পীরের কাছে। তারা কেঁদে কেঁদে পীর সাহেবকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। একপর্যায়ে শিবলী রাহিমাহুল্লাহ সকলকে নিয়ে গোল হয়ে বসলেন; মাঝখানে রাখলেন আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলুসিকে। সবাই শুরু করে দিলেন কুরআনের তেলাওয়াত। সবার উদ্দেশ্য হলো তাদের পীর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসুক। ইখলাসের সাথে তেলাওয়াত করছিলেন। অনেকক্ষণ তেলাওয়াত করার পর হঠাৎ আবু আবদুল্লাহ উন্দুলুসি মাঝখান থেকে চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, আমাকে তাড়াতাড়ি গোসল করাও! সাথে সাথে তাকে গোসল করানো হলো। আল্লাহ পাক ফিরিয়ে দিলেন তাকে পূর্বের সম্পদ। সর্ব-অঙ্গে আবার ছড়িয়ে পড়ল ঈমানের নূর। এরপর তারা সবাই বাগদাদে ফিরে আসলেন।

কথিত আছে, আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলুসি রাহিমাহুল্লাহ স্বদেশে এসে তার মুরিদানদের নিয়ে পুনরায় খানকার কাজ শুরু করলেন। এদিকে উন্দুলুসিকে নিয়ে যাওয়ার খবর খ্রিষ্টান পল্লীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। খ্রিষ্টান মেয়েটি যখন জানতে পারল, তার হবু স্বামী স্বদেশে চলে গেছে তখন থেকে তার অস্থিরতার সীমা রইল না। বারবার শুধু উদুলুসিকে স্মরণ করছিল। এক পর্যায়ে সেও স্বদেশ ছেড়ে বাগদাদে রওনা হয়ে যায়। লোক মারফতে জিজ্ঞেস করতে করতে ঠিকই উন্দুলুসির সন্ধান পেয়ে যায়।

এরপর তিনি কোনো মুরিদের মাধ্যমে সংবাদ পাঠালো যে, অমুক দেশ থেকে খ্রিষ্টান মেয়েটি এসেছে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে। এটা শোনামাত্রই উন্দুলুসি রাহিমাহুল্লাহ চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। যার জন্য এত দিন দ্বীনহারা হয়ে শুকর চরাতে হলো সে আজ আমার দুয়ারে! নাজানি আবার কী সর্বনাশ করতে এসেছে! এ চিন্তায়ই তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। এভাবে কেটে গেল প্রায় ঘণ্টা খনেক। এক সময় জ্ঞান ফিরে এলে আবারো তাকে সংবাদ দেয়া হলো মেয়েটির ব্যাপারে। তখনও তিনি পূর্বের মতো জ্ঞানশূন্য হয়ে যান। এবারো অনেক সময় কেটে যাওয়ার পর পুনরায় জ্ঞান ফিরে পান। এবার পীর সাহেব নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটি কি এখনও চলে যায় নি?

বলা হলো, মেয়েটি এসেছে আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে। এরপর তিনি শরিয়ত সম্মতভাবে ইসলাম গ্রহণ করালেন। মেয়েটির একান্ত ইচ্ছা ছিল জীবনসঙ্গী হিসেবে পীর সাহেবকে পাবে। কিন্তু না পাওয়াটা যখন একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেল, তখন তার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগল, তাদের বাড়ির সেই আবু আব্দুল্লাহকে পৃথিবীর অন্যতম সেরা পীর অবস্থায় শুধু একপলক দেখবে। উন্দুলুসি রাহিমাহুল্লাহ তার এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দিলেন না। বললেন, তুমি শরিয়তের ওপর চলো, তোমার সাথে আমার সাক্ষাত হবে আখেরাতে। এরপর মেয়েটি আর দেশে ফেরেনি। সেখানেই একটি কুটির বানিয়ে দেয়া হয় তার জন্য। সেখানে অহর্নিশ কাটিয়ে দেয় ইবাদতে।

যাদুস সালেকিন

তাযকিয়াতুন নুফূস

দুনিয়াবিমুখ আলেমদের গল্প

ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন

শয়তানের ফাঁদ

আল কাউসার

https://www.banuri.edu.pk/login

https://darulifta-deoband.com/

প্রতিকার

আল্লাহর প্রতি ভয়ই আত্মার ব্যাধি থেকে বাঁচাতে পারে। আমাদের যুবায়ের উস্তাজ হাফিজাহুল্লাহ সব সময় ক্লাসের শুরুতে একটা কথা বলেন।

"আমাদের কে দেখছেন?
আমার আল্লাহ আমাদের দেখছেন।
আমরা কাকে রাজি খুশি করার জন্য ইলম অর্জন করছি?
আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য ইলম অর্জন করছি।"

আত্মার ব্যাধি থেকে বাঁচার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল ইখলাছ।

আমরা দুনিয়াবী কোন কাজ করার আগে যদি নিজের অন্তরকে একবার প্রশ্ন করি, যে "আমি কেন এ কাজটা করছি?" উত্তর যদি এমন হয় "দুনিয়ার জন্য" তাহলে বুঝতে হবে আমার অন্তরে ব্যাধি আছে। আর এ ব্যাধি থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে সর্ব অবস্থায় নিজের অন্তরকে প্রশ্নের মধ্যে রাখতে হবে। আবার যদি প্রশ্নের উত্তর এমন হয় "আমার আল্লাহ সন্তুষ্টি" তাহলে বুঝব আমি আত্মার ব্যাধি থেকে মুক্ত আছি।

আত্মার বেধি থেকে বাঁচতে আরো কিছু বিষয় আছে, তা হলো দুনিয়া বিমুখ হওয়া দুনিয়ার প্রতি অধিক ভালবাসা আমাদের অন্তরের ব্যাধির আরেকটা কারণ। আল্লাহর নিকট আমরা দুনিয়া চাইবো ততটুকু যতটুকু পেলে আমরা আল্লাহকে ভুলে না যাব এবং সব সময় তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে।

তাকওয়া

الْوَرْعُ وَالتَّقْوى (আল্লাহ ভীতি)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহ ভীতি অর্জন করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

'হে মুমিনগণ, তেমরা যখন গোপনে পরামর্শ করবে তখন তোমরা যেন গুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে গোপন পরামর্শ না কর। আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়া বিষয়ে গোপন পরামর্শ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।' (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:৯)

তাকওয়ার কাজে আল্লাহ (সুবহানাহু) বান্দাদের পরস্পরে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।' (সূরা মায়েদা ৫:২)

মূলত কুরআন নাজিল করাই হয়েছে মুত্তাকীনদের জন্য।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

'এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, এটি মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত। (আ'রাফ ৭:৯৬)

তাকওয়ার তিনটি স্তর:

প্রথম স্তর:

الأول :التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشر

শিরকমুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করা। এ অর্থের ভিত্তিতেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى

'এবং তাকওয়ার বাণী তাদের জন্য অপরিহার্য করলেন।' (ফাতাহ ৪৮:২৬)

দ্বিতীয় স্তর:

الثانية :التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم و هو المتعارف باسم التقوي في الشرع

'সকল প্রকার করণীয় ও বর্জনীয় গুনাহ থেকে নিরাপদ দূরে থাকা এমনকি সগীরা গুনাহ থেকেও। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া বলতে এ প্রকার তাকওয়াকেই উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম। (আ'রাফ ৭:৯৬)

তৃতীয় স্তর:

الثالث :أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق و يتبتل اليه بشراشره وهو التقوي الحقيقي

'যে সকল কাজ আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দেয় তা থেকে সম্পর্ণরূপে মুক্ত হয়ে সরাসরি আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া। এটাই হলো প্রকৃত তাকওয়া। পবিত্র কুরআনে নিম্নের আয়াতটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। আর খবরদার! মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না।'(আলে ইমরান ৩:১০২)

তাকওয়া অর্জনের উপায়

وَقَالَ ابْنِ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ حَقِيقَةَ التَّقْوِي حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে সংশয় সৃষ্টি বস্তু ত্যাগ না করবে অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত জিনিস বর্জন করে সন্দেহমুক্ত জিনিস গ্রহণ করাই হলো তাকওয়ার হাকীকত।'(বুখারী ৭)

ইখলাস

প্রতিটি বস্তুকেই অপর কোনো বস্তু কলুষিত করে দিতে পারে। যখন কোনো বস্তু অপর বস্তুর কলুষতা থেকে পরিচ্ছন্ন ও মুক্ত হয়, তখন তাতে ইখলাসের শিরোনাম যুক্ত হয়।

ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার বিপরীত হচ্ছে ইশরাক তথা অন্যকে শরীক করা। যে- ব্যক্তি একনিষ্ঠ হয় না, সে শিরককারী হয়। তবে শিরক তথা অন্যকে শরীক করার কয়েকটি স্তর রয়েছে।

তাওহীদের (একত্ববাদ) বিশ্বাসে ইখলাসের (একনিষ্ঠতা) বিপরীত হচ্ছে প্রভুত্বের ক্ষেত্রে করা শিরক।

কিছু শিরক প্রকাশ্য এবং কিছু অপ্রকাশ্য। এমনিভাবে ইখলাসের মধ্যেও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুটি ভাগ রয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা রিয়া তথা লৌকিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় এর স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা আলোচনা করব ঐ ব্যক্তির কথা, যে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনে ব্রতী হয়, কিন্তু এর সাথে এসে মিশ্রিত হয় অন্য কোনো উদ্দেশ্য। লৌকিকতা অথবা নিজের অন্য কোনো স্বার্থ।

যেমন: রোযা রাখার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তের পাশাপাশি এর মাধ্যমে অর্জিত শারীরিক উদ্যমের উপকার লাভ করতে চাওয়া। অথবা কোনো গোলাম আযাদ করা তার খরচ এবং মন্দ আচরণ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। অথবা সফরের কষ্টের সাথে খাপ খাওয়ায় খরাচাদি বাঁচাতে অথবা আগত কোনো বিপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে হজ করে নেওয়া। যুদ্ধ দেখা এবং রণকৌশল শেখার জন্য জিহাদে যাওয়া। রাতে তন্দ্রাভাব দূর করতে নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়া; যেন কাফেলাকে অথবা পরিবারকে পাহারা দিতে সহজ হয়। অথবা প্রয়োজনীয় সম্পদ কামাইয়ের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা। অথবা কালাম শাস্ত্রের স্বাদ লাভের পর তা অন্যকেও শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। তো কোনো আমলের প্রধান উদ্বুদ্ধকারী-প্রভাবক আল্লাহ তাআলার

নৈকট্য অর্জন হলেও পরবর্তীতে তার সাথে এ-ধরনের কোনো চিন্তা যুক্ত হওয়ার ফলে আমলটি তার কাছে সহজ মনে হতে থাকে। আর তখনই সেই আমল ইখলাসের সংজ্ঞার আওতা থেকে বেরিয়ে যায়।

মানুষের খুব কম আমল অথবা কাজ এই নিষ্ঠাহীনতা থেকে মুক্ত। এ-জন্যই বলা হয়েছে, যার জীবনের একটি মুহূর্তও একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে অতিবাহিত হয়েছে, সে নাজাত পেয়ে যাবে। এর কারণ হচ্ছে ইখলাসের সম্মান এবং এ-সকল কদর্যতা থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখার কষ্টসাধ্যতা। কেননা, একমাত্র ঐ ব্যক্তিই একনিষ্ঠ হবে, যাকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যই আমল করতে উদ্বুদ্ধ করবে। অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না।

সাহল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'কোন বস্তু নফসের ওপর সবচেয়ে ভারী?' তিনি বললেন, 'ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা। কারণ, এতে প্রবৃত্তির কোনো অংশ নেই।'

ইখলাসকে কলুষিতকারী বিষয়সমূহের মাঝে স্তরভেদ রয়েছে। তন্মধ্য হতে কিছু প্রকাশ্য, কিছু অপ্রকাশ্য। আর আমরা ইতিপূর্বে লৌকিকতা সংক্রান্ত অধ্যায়ে এর স্তরসমূহের আলোচনা করেছি।

লৌকিকতার মধ্য থেকে এমন লৌকিকতাও আছে, যা পিঁপড়ার হামাগুড়ি থেকেও সূক্ষ্ম। পেছনে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে, আমলকারী তার আমল অবস্থায় যতক্ষণ মানুষের অবলোকন এবং প্রাণীর অবলোকনের মাঝে পার্থক্য মনে করবে (অর্থাৎ মানুষের অবলোকন তার আমলে প্রভাব ফেলবে), ততক্ষণ সেই আমল ইখলাসের গুণ থেকে বহির্ভূত থাকবে। যে- ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি সূক্ষ্ম এবং নিজে আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা ও তাওফীক লাভের সৌভাগ্যধন্য, সে ব্যক্তিই কেবল শয়তান থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

বর্ণিত আছে, একজন আলিমের দুই রাকাত নামায একজন জাহিলের ৭০ রাকাত নামায থেকে উত্তম। কিন্তু এখানে আলিমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যিনি আমলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিপদ সম্পর্কে অবগত হয়ে আমলকে সেগুলো থেকে মুক্ত রাখতে পারেন, তিনি। কেননা, অজ্ঞ ব্যক্তি তার আমলের বাহ্যিক দিকের প্রতিই লক্ষ করে। স্বর্ণব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এক কীরাত স্বর্ণ মূর্খ-নির্বোধের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এক দীনার থেকেও উত্তম।

যিকির

জেনে রাখুন, কুরআন তিলাওয়াতের পর যবানে আদায়কৃত সবচেয়ে উত্তম ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার যিকির ও একনিষ্ঠ দুআয় নিজের প্রয়োজনকে আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করা। যিকিরের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়ে দেয় আল্লাহ তাআলার এই বাণী-

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

“তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব” (সূরা বাকারা: ১৫২)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

“যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়েশুয়ে আল্লাহ তাআলার যিকির করে” (সূরা আলে ইমরান: ১৯১)

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ .

“পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্য থেকে যারা অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার যিকির করে” (সূরা আহযাব: ৩৫)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন,

"বান্দা যতক্ষণ আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে ঠোঁট নাড়ায় ততক্ষণ আমি তার সাথে থাকি।"('মুসনাদু আহমাদ: ১০৯৭৬)

বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে জাতি আল্লাহ তাআলার যিকিরের উদ্দেশ্যে উপবিষ্ট হয় তাদেরকে ফেরেশতাগণ ঘিরে রাখেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাদের উপর প্রশান্তি বর্ষিত হয় এবং ফেরেশতাগণের কাছে তাদের কথা তিনি আলোচনা করেন। হবে।'(মুসনাদু আহমাদ: ১১৮৭৫)

আমলের ফযীলতের আলোচনায় এ সংক্রান্ত অনেক হাদীস রয়েছে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি লোকেরা কোনো মজলিস থেকে আল্লাহর যিকির ছাড়াই উঠে যায়, তারা যেন মৃত গাধার মতো উঠে গেল। কিয়ামাতের দিন সেই মজলিস তাদের আক্ষেপের কারণ হবে। (মুসনাদু আহমাদ: ১০৬৮০)

অপর হাদীসে রয়েছে-'যে মজলিসে আল্লাহর যিকির করা হয় না এবং নবীর উপর দরূদ পাঠ করা হয় না, সেই মজলিস তাদের জন্য কিয়ামাতের দিন আক্ষেপের কারণ হবে। (মুসনাদু আহমাদ: ৭০১৩)

তাওবা

الإسْتَقَّارُ। (তাওবা ও ইসতিগফার)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো তাওবা করা। তাওবা শব্দের অর্থ রুজু করা, প্রত্যাবর্তণ করা। নিজের গুনাহের কারণে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে আর কোনো অন্যায় না করার অঙ্গীকারের নামই হলো তাওবা। সঠিকভাবে তাওবা করলে আল্লাহ সুবহানাহু অবশ্যই কবুল করবেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কছে তাওবা কর, খাটি তাওবা। আশা করা যায় তোমাদের রব তোমদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। নবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।' (তাহরিম ৬৬:৮)

কিছু কথা

গুনাহ পরম সৃষ্টিকর্তার সাথে বান্দার আড়াল সৃষ্টি করে। যা সৃষ্টিকর্তার সাথে আড়াল তৈরি করে তা থেকে ফিরে আসা বান্দার জন্য অত্যাবশ্যক। এই ফিরে আসা সম্পন্ন হবে গুনাহের নিন্দীয়তা অনুধাবন, কৃতকর্মের প্রতি অনুশোচনা এবং তা বর্জনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে। কেননা, যখন কেউ জানতেই পারবে না যে, গুনাহ হচ্ছে প্রেমাস্পদ থেকে দূরত্ব সৃষ্টির কারণ, তখন সে তার গুনাহের জন্য অনুশোচিত হবে না। আল্লাহ থেকে দূরত্বের পথে চলার পরও মনে কোনো ব্যথা সৃষ্টি হবে না। আর ব্যথা সৃষ্টি না হলে বান্দার পক্ষে ভুল পথ থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

কুরআনে তাওবার নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাওবার আদেশ দিয়ে বলেন-

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা নূর: ৩১)

তিনি আরো বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আন্তরিক তাওবা করো। (সূরা তাহরীম: ৮)

তিনি আরো বলেন-

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা বাকারা: ২২২)

হাদীসে তাওবার নির্দেশ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তাওবা করো। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে একদিনে শতবার তাওবা করি।' (মুসলিম: ২৭০২; মুসনাদু আহমাদ: ১৭৮৮০; নাসায়ী: ১০২৮০)

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি আনন্দিত হন, যে-ব্যক্তি কোনো মরুভূমির বিজন প্রান্তরে থাকে। তার সাথে থাকা সওয়ারীর উপরে তার খাবার এবং পানীয় রয়েছে। হঠাৎ সে-ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়ে। আর জেগে দেখে তার সওয়ারীটি নেই। সে খুঁজতে খুঁজতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর সেই ব্যক্তি নিরাশ হয়ে মনে মনে বলে, "আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাব এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করব।" এ-কথা বলে সে মৃত্যুর অপেক্ষায় তার বাহুর উপর ঘুমিয়ে পড়ে। অতঃপর জেগে উঠে দেখতে পায় তার শিয়রের কাছেই তার সওয়ারীটি দাঁড়িয়ে আছে। তার খাবার এবং পানীয় যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে। এই ব্যক্তি তার হারানো সওয়ারী দেখে যতটা আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দার তাওবায় এর চেয়ে বেশি আনন্দিত হন। (বুখারী: ৫৯৪৯; মুসলিম: ২৭৪৪; তিরমিযী: ২৪৯৯)

এ-ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

গুনাহগারের উপর তাওবা ওয়াজিব-এ-ব্যাপারে সর্বসম্মত ঐকমত্য গঠিত হয়েছে। কেননা, গুনাহ হচ্ছে মানবাত্মার বিধ্বংসের উপকরণ। গুনাহ বান্দাকে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই গুনাহ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পালিয়ে আসা উচিত।

তাওবা সবসময়ের জন্য আবশ্যক। কেননা, মানুষ কোনো মুহূর্তেই গুনাহ থেকে মুক্ত নয়। যদি কেউ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গুনাহ থেকে মুক্ত থাকে, সে অন্তরের গুনাহ

থেকে মুক্ত নয়। যদি অন্তরের গুনাহ থেকেও মুক্ত থাকে, তবুও শয়তানের

প্রতারণায় প্রতারিত হয়ে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। যদি কেউ এটি থেকেও মুক্ত থাকে, তবে সে আল্লাহ তাআলা, তাঁর গুণাবলি এবং কার্যাবলি সম্পর্কে জানার অপূর্ণতা ও উদাসীনতা থেকে মুক্ত নয়। তাই কোনো মানুষই কোনো-না-কোনো অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত নয়। তবে মানুষের মাঝে অসম্পূর্ণতার পরিমাণে তারতম্য আছে।

এ-জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার অন্তরে কখনো কখনো বিশেষ অবস্থা তৈরি হয়, ফলে আমি দিনে-রাতে সত্তর বার আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করি।' (মুসলিম: ২৭০২; আবু দাউদ: ১৫১৫)

এ-জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্মানিত করেছেন এ-কথা বলে-

| لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত-ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন।
(সূরা ফাতহ: ২)

ভাবুন, তাহলে অন্যদের অবস্থা কীরূপ হতে পারে?

তবে তাওবা কবুলের জন্য তাওবার মধ্যে তার শর্তসমূহের সমন্বয় ঘটা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন।(সূরা শূরা: ২৫)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মানুষের মৃত্যু তার শাহরগের কাছে আসা পর্যন্ত তাওবা কবুল করেন।' (তিরমিযী: ৩৫৩১; ইবনু মাজাহ: ৪২৫৩)

তাযাকিয়া

শাব্দিকভাবে তাযাকিয়া শব্দটি দু'টি অর্থে আসে

প্রথম অর্থ; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করা। যেমন বলা হয় زَكَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ

'যাক্কাইতু হাযাছ ছাওবা' আমি এই কাপড়টি পরিষ্কার করেছি।

কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াত:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।” (তাওবা ৯:১০৩)

এই আয়াতে 'তাযকিয়া, শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

দিতীয় অর্থ:

বৃদ্ধি পাওয়া, বেড়ে যাওয়া। যেমন আরবরা বলে “যাকাল মালু ইয়াযকু, সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।” ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রোকন যাকাতকে এ উভয় অর্থের বিবেচনাতেই যাকাত বলা হয়। কারণ যাকাত আদায়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট সম্পদ পরিশুদ্ধ হয় এবং বরকত বৃদ্ধি পায়।

তাযকিয়ার পারিভাষিক অর্থ:

ইসলামের পরিভাষায় 'তাযাকিয়া, শব্দটি ব্যক্তি তার নফসকে শিরক- বিদআত ও অন্যান্য পাপাচারসহ সমস্ত ধরনের কলুষতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে সজ্জিত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَوَلَّى

অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে।(আ'লা ৮৭:১৪)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا ()وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

'নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে। এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তার (নফসকে) কলুষিত করেছে।(শামস ৯১:৯-১০)

এ উভয় আয়াতে 'তাযকিয়া' শব্দটি আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পঙ্কিলতা মুক্ত করার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাযকিয়ার মর্মকথা:

তাযকিয়ার মর্মকথা হচ্ছে: সমস্ত গাইরুল্লাহকে বর্জন করে কেবলমাত্র আল্লাহকে গ্রহণ করে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। হাদীসে জিবরাঈলে 'ইহসান, বলতে তাযকিয়ার এ চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকেই বুঝানো হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে:

أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি এটা সম্ভব না হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন একথা মনে মনে ভাববে।' (সহীহ মুসলিম ১০২; সহীহ বুখারী ৫০; সুনানে আবু দাউদ ৪৬৯৭)

এটার নামই 'ইহসান, এটার নামই 'ইখলাস, এটাই ঈমানের সর্বোচ্চ শিখর। এটাই সকল ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত। এটার জন্যই পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'আর তাদেরকে ইহা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করে।' (সূরা বাইয়্যেনাহ ৯৮:৫)

তাযকিয়ার মর্মকথা হলো, সকল গাইরুল্লাহ থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। কোনো প্রকার ভায়া মাধ্যম থাকবে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্টভাবে তাঁর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনসমুহ সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই (অর্থাৎ আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন পীর- ফকিরের ভায়া-মাধ্যম গ্রহণ করিনা।' (আন'আম ৬:৭৯)

তাযকিয়ার মানেই হচ্ছে, কোনো ভায়া-মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লাহর ইবাদত করা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: يِاكَ نَعْبُدُ' আমরা কেবল মাত্র তোমারই ইবাদত করি।

তাযকিয়ার মানেই হচ্ছে, কোন ভায়া-মাধ্যম ছাড়া সারাসরি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وايَاكَ نَسْتَعِين

এবং কেবলমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই। (ফাতিহা ১:৫)

তাযকিয়ার মানে হচ্ছে, সকল প্রকার তাগূত ও তার বহুরশি ত্যাগ করে এক আল্লাহর এক রজ্জু ধারণ করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়। (বাকারা২:২৫৬)

তাযকিয়ার মানে হচ্ছে, মক্কার কুফফারদের মূর্তির মতো কোনো পীর- বুযুর্গদের সুপারিশকারী ও মধ্যস্থতাকারী কিংবা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তাকারী হিসেবে গ্রহণ না করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُم ولا يَنفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هَؤُلاءِ
شُفَعَاوْنَ عِنْدَ الله

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর ইবাদত করে, যা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারও করতে পারে না,। তারা বলে: এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। (সূরা ইউনূস ১০:১৮)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلى اللهِ زُلْفِى

'আর যারা তাকে ব্যতীত অলী আউলিয়া ধারণ করেছে (এবং প্রার্থনা ও মান্নত-মানসা ইত্যাদি ইবাদত সাব্যস্ত করে) তারা বলে আমরা তাদের উপাসনা করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছিয়ে দিবে।(সূরা যুমার ৩৯:৩)

যারা আল্লাহর পরিবর্তে খাজাবাবা, গাজাবাব, লেংটাবাবা, পীরবাবা, দরগাওয়ালা, দূর্গাওয়ালা, খাজা নেওয়াজ, গরীব নেওয়াজ, জুলফে দারাজ, গেছু দারাজ, আতা বখশ, গঞ্জে বখশ, গাউসুল আজম, কুতুবুল আলম, ইত্যাদির নিকট প্রার্থনা করে অথবা তাদের ভায়া-মাধ্যম বানায় তাদের কঠোরভাবে তিরস্কার করে আল্লাহ সুবহানাহু ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ يَخْلُقُوْ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَطْلُوبُ - مَا قَدَرُ وَ اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

'হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হলো। মনোযোগ দিয়ে তা শোনো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে সকলেই একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনেয়ে নেয় তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল। তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী। (সূরা হজ্জ ২২:৭৩-৭৪)

এ আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে, আর তা হলো তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ভায়া- মাধ্যম তালাশ করার মূল কারণ এটাই। অর্থাৎ আল্লাহর সম্পর্কে মন্দ ধারণা করা। যেমন: আল্লাহ সরাসরি শুনবেন না, অথবা শুনলেও দিবেন না তাই কিছু পীর-বুযুর্গের ভায়া-মাধ্যম ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়। তারা বলে জজের কাছে কিছু বলতে হলে উকিল ধরতে হয়, প্রাধানমন্ত্রীর কাছে কিছু চাইতে হলে মন্ত্রি, এমপির

সুপারিশ নিতে হয়। সেভাবেই আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হলে পীর-বুযুর্গদের সুপারিশ নিতে হয়। মূলত তাদের একথাটাও আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণারই বাস্তব ফল। নতুবা আল্লাহকে দুনিয়ার আদালতের একজন সাধারণ জজের সাথে তুলনা করা অথবা প্রধানমন্ত্রির সাথে তুলনা করা কতইনা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা। দুনিয়ার জজ গায়েব জানে না। তাই সত্য মিথ্যা উদ্‌ঘাটনের জন্য উভয় পক্ষের উকিলদের জেরার মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়। অথচ আল্লাহ হলেন আলেমুল গায়েব।

দুনিয়ার জজ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিজ চোখে দেখা খুনিকেও ফাঁসি দিতে পারেন না যদি সাক্ষী-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়। অথচ আল্লাহ হলেন আহকামুল হাকিমীন। তিনি কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। তিনি নিজের ইলম দ্বারাই বিচার করতে সক্ষম। আর প্রধানমন্ত্রির সঙ্গে তুলনা! সেতো আরেক হাস্যকর বিষয়। প্রধানমন্ত্রির কাছে আবেদন করতে হলে মন্ত্রি, এমপির সুপারিশ নিতে হয়। তবে কার? যাকে প্রধানমন্ত্রি চিনে না। কোন্ দল করে কিরকম লোক তা জানে না। এরকম ব্যক্তির বেলায় যারা তাকে চিনে তাদের সুপারিশ প্রয়োজন হয়। আর যারা প্রধনমন্ত্রির নিজস্ব লোক যাদেরকে প্রধানমন্ত্রি চিনেন তাদের কি কোনো সুপারিশ নিতে হয়? না। বরং তারা কারো সুপারিশ নিলে তিনি রাগ করবেন। তাহলে আল্লাহর কাছে কি এমন কোনো বান্দা আছে যাকে আল্লাহ চিনেন না? এরকম কেউ নেই। বরং যে যত বড় অন্যায় করুক না কেন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করে তবে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوْرًا رَحِيمًا

'আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।' (সূরা নিসা ৪:১১০)

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ক্ষমা করে দিবেন। কোনো ভায়া-মাধ্যমের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

আর তোমাদের রব বলেন: তোমরা সকলে আমাকেই একক ভাবে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব, যারা অহমিকার বশে আমার বন্দেগী করা অস্বীকার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়। (সূরা মু'মিন ৪০:৬০)

সবর

সবরের (ধৈর্য) ফযীলত

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের ৯০ জায়গায় ধৈর্যের আলোচনা করেছেন এবং এর সাথে কল্যাণ ও মর্যাদাকে সম্পৃক্ত করে সেগুলোকে ধৈর্যের সুফল অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। (সূরা সাজদাহ: ২৪)

সবরের পরিচয়

সবর একমাত্র মানুষেরই সহজাত একটি বৈশিষ্ট্য। জীব-জন্তুর বুদ্ধিমত্তার অসম্পূর্ণতার কারণে তাদের মাঝে ধৈর্য নেই। আর জীব-জন্তুর মধ্যে প্রবৃত্তির চাহিদা প্রবল, কিন্তু তার কোনো নিয়ন্ত্রক নেই। আবার ফিরিশতাদের মাঝেও ধৈর্য নেই। কারণ, তাঁরা সম্পূর্ণ। তাঁরা নিজেদের সকল আগ্রহ মহান রবের সমীপে নিবেদন করেছেন। তাঁদের উপর এমন কোনো প্রবৃত্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, যা তাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখবে।

পক্ষান্তরে মানুষকে জীব-জন্তুর মতোই অসম্পূর্ণতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়। এরপর প্রথমে তার মাঝে শুধু খাবারের চাহিদা সৃষ্টি করা হয়। যা তার প্রয়োজন। এরপর তার মাঝে খেলাধুলা ও সাজ-সজ্জার চাহিদা প্রকাশ পেতে থাকে। এরপর প্রকাশ পায় বিবাহের চাহিদা। তখনও তার পরিপূর্ণ ধৈর্যের শক্তি থাকে না। এক সময় তার বুদ্ধিমত্তার সঞ্চালন শুরু হয় এবং তা পরিপক্ক হয়ে উঠতে থাকে। এরপর নিজের ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বয়স হলে তার মাঝে হিদায়াতের

আলো প্রকাশ পেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সে সাবালক অবস্থায় উপনীত হয়। যেমন: ভোরের আলো প্রকাশ পেতে পেতে সূর্যের বৃত্ত উদিত হয়। কিন্তু তার এই হিদায়াত হয় সীমাবদ্ধ। আখিরাতের কল্যাণের দিকে নির্দেশনা তার জন্য থাকে না। অতঃপর যখন সে শরীয়ত জানার সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তার সামনে আখিরাত সম্পৃক্ত বিষয়াদি উদ্ভাসিত হতে থাকে এবং তার সুরক্ষার সরঞ্জাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে মানুষের স্বভাব যা ভালোবাসে, তাই তার চাহিদা হয়ে ওঠে। তখন শরীয়ত ও বিবেকের তাড়না তা নিষেধ করে। এভাবে তাদের মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধের ময়দান হচ্ছে বান্দার অন্তর। সুতরাং ধৈর্য হচ্ছে এমন অটলতার নাম, যা প্রবৃত্তির প্রচারকের বিরোধিতায় দ্বীনের প্রচারকের ভূমিকা পালন করে। যদি কেউ অটল থেকে প্রবৃত্তিকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে ধৈর্যশীলদের তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি দুর্বল হয়ে প্রবৃত্তি তাকে গ্রাস করে নেয় এবং প্রবৃত্তির দমনে ধৈর্য ধারণ করতে না পারে, তাহলে সে শয়তানের অনুচরে পরিণত হবে। তাই যেহেতু প্রমাণিত হলো যে, সবর হচ্ছে প্রবৃত্তির বিরোধিতায় দ্বীনের পক্ষে অটলতার নাম, সেহেতু তা শুধু মানুষেরই বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

শোকর

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো কৃতজ্ঞা জ্ঞাপন করা। আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে খুব সহজেই প্রকাশ করতে পারে যে, এ সকল নেয়ামতের ক্ষেত্রে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই বরং আল্লহর অনুগ্রহেই সবকিছু হয়। এভাবে যখন মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ সুবহানাহু তার অনুগ্রহ আরো বৃদ্ধি করে দেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন।' (সূরা ইবরাহীম ১৪:৭)

এ আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আল্লাহর অকৃজ্ঞতার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুবহানাহু) আরো সুস্পষ্টভাবে তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

'অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় কর, আমার সাথে কুফরী করো না। (সূরা বাকারা ২:১৫২)

যাদুস সালেকিন
তাযকিয়াতুন নুফূস
ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন

অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু ওযিফা।

১। পাঁচওয়াক্ত নামায সহিহ-শুদ্ধভাবে আদায় করা:

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, আদাব এবং খুশুধুযুর সাথে নামায আদায় করলে তা সহিহ ও শুদ্ধ হয়। প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে তাকবিরে উলার সাথে জামাতে নামায আদায় করলে নামায কামেল হয়। এরূপ নামাযের অনেক সওয়াব। এভাবে পাবন্দির সাথে সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য পাবন্দির সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা বড়ই ফলপ্রসূ।

২। সুন্নত ও নফল :

পাঁচওয়াক্তের নামাযের সাথে সাথে বেতর এবং সুন্নতে মুআক্কাদার পাবন্দি করা এবং সাধ্যানুযায়ী নফল নামায পড়ার চেষ্টা করা। কেননা একে তো সুন্নত ও নফলের অনেক সওয়াব রয়েছে। তাছাড়া সুন্নত ও নফল নামায ফরজের জন্য পরিপূরকও বটে।

৩। তাহাজ্জুদ নামায :

পাবন্দির সাথে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়া। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদিন এবং আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ অত্যন্ত গুরুত্ব এবং পাবন্দির সাথে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। এই সময় বিশ্বের কোটি কোটি আল্লাহর প্রেমিকগণ তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতির সাথে মোনাজাতে রত থাকেন। মোনাজাতের জন্য এটা একটা বিশেষ সময়।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এই নামাযের অধিক সওয়াব এবং ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাহাজ্জুদ নামায দুই রাকাতও পড়া যায়। এবং শক্তি অনুসারে অধিকও পড়া যেতে পারে। তবে উত্তম হলো, কমপক্ষে চার রাকাত আদায় করা।

তাহাজ্জুদ নামাযের পর ১২ তাসবিহের আমল করা। বার তাসবিহ পড়ার নিয়ম হলো- لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ২০০ বার, إلا الله (ইল্লাল্লাহ) ৪০০ বার, الله الله (আল্লাহু আল্লাহ) ৬০০ বার, الله (আল্লাহ) ১০০ বার।

৪। তেলাওয়াত:

দৈনিক পাবন্দির সাথে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করা চাই। বিশেষ করে সূরা ইয়াসিন, ওয়াকিয়া, মুলক, বাকারা, তিন কুল (সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস), আয়াতুল কুরসি, হাশর এবং বাকারার শেষ আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা খুবই ফযিলতের কাজ।

হাদিসে পাকে বর্ণিত আছে যে, বিসমিল্লাহসহ সুরায়ে ইখলাস ৩বার তেলাওয়াত করলে একবার পবিত্র কুরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায়। ৩বার সুরায়ে ইখলাস তেলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তিদের রুহের মাগফিরাতের জন্য বখশে দেওয়া অতি সহজ ও সুন্দর আমল। যদি কারণবশত কোনো দিন তেলাওয়াতের সময় সুযোগ না হয়, তাহলে চলার পথে রিকশা, গাড়ি এবং বাসে বসে যতটুকু মুখস্থ আছে ততটুকু তেলাওয়াত করে নেওয়া চাই।

সবার জন্য দৈনিক কমপক্ষে ৫পৃষ্ঠা কুরআন শরিফ দেখে দেখে তেলাওয়াত করতে হবে। হাফেজে কুরআনের জন্যও ৫ পৃষ্ঠার বেশি নজরানা পড়া চাই।

তেলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা:

(ক) কুরআন পাক তেলাওয়াত করলে দিলের জং দূর হয় এবং দিল পরিষ্কার হয়।

(খ) কুরআন পাক তেলাওয়াত করলে আল্লাহ তাআলার মহব্বত বাড়ে এবং তার নৈকট্য লাভ হয়।

(গ) কুরআন পাক তেলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফে কমপক্ষে দশটি করে নেকি পাওয়া যায়। চাই সে বুঝে পড়ুক অথবা না বুঝে পড়ুক। যারা বলে যে, না বুঝে পড়লে কোনো ফায়দা নেই, তাদের কথা ঠিক নয়। তেলাওয়াতের বিশেষ দুটি আদব :

(ক) তেলাওয়াতকারী দিলে দিলে এই খেয়াল করবে যে, আল্লাহ তাআলা বলছেন যে-'শোনাও! তুমি কেমন পড়তে পারো। আমি শুনি!'

(খ) শ্রোতাগণ দিলে দিলে এই খেয়াল করবে যে, এখানে আল্লাহ তাআলার শাহি কালাম তেলাওয়াত করা হচ্ছে। তাই খুব আযমত ও মহব্বতের সহিত শুনি।

আত্মশুদ্ধি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু দোয়া।

- اللَّهُمَّ أَعِنَيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্র (স্মরণ), শুক্র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর।
(আহমাদ, মুসনাদ ৫/২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, আবূদাউদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান, ১৩০২ নং)

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ۔

অর্থ:- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কুফরী, দারিদ্র ও কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি।
(হাকেম, মুস্তাদরাক ১/৩৫, নাসাঈ, সুনান, আহমাদ, মুসনাদ, তামামুল মিন্নাহ্, আলবানী ২৩৩পৃঃ)

- اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার হালাল দ্বারা পরিতুষ্ট করে আপনার হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ছাড়া অন্য সকলের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।
(তিরমিযী ৫/৫৬০, নং ৩৫৬৩)

একটি ঘটনা

মুহাম্মদ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাই। ইয়ামানের গভর্নর। এক অনুচরের হাতে ৫০০ দিনাব দিয়ে বললেন, এটা তউস ইবনে কায়সানের হাতে দিয়ে আসো। যদি তাকে এই দিনারগুলো গ্রহণ করাতে পারো তাহলে তোমাকে পুরস্কৃত করবো।

অনুচর ৫০০ দিনার নিয়ে এলো তউস ইবনে কাসানের কাছে। তউস ইবনে কায়সান দিনার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অনেক চাপাচাপি করেও তাকে গ্রহণ করানো গেলো না। শেষে অনুচর দিনারের খলে তউস ইবনে কায়সানের ঘরের কোনে ছুড়ে ফেলে চলে গেল। গভর্নরকে বললো, তিনি দিনার গ্রহণ করেছেন। কিছুদিন পর মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ কোনো কারনে তউস ইবনে কাসানের উপর ক্ষিপ্ত হন।

'তাকে যে ৫০০ দিনার দিয়েছি ফেরত নিয়ে আসো' একজনকে আদেশ দিলেন গভর্নর।

সেই ব্যক্তি এলো তউস ইবনে কায়সানের কাছে।

'গভর্নর আপনাকে যে ৫০০ দিনার দিয়েছেন তা ফেরত দিন' বলল সে।

'আমি কোনো দিনার নেইনি' তউস ইবনে কায়সান অস্বীকার কবলেন। প্রথম অনুচবকে ডাকা হলো। সে এসে বললো, দিনার আপনার ঘরে রেখে গিয়েছিলাম।

'তাহলে যেখানে বেখেছো খুঁজে দেখো' তউস ইবনে কায়সান বললেন। অনুচর খুঁজে দেখে সে যেখানে দিনার রেখে গেছে সেখানেই আছে। কেউ ধরেও দেখেনি। দিনারের থলের উপর মাকডসা জাল বুনেছে।

তউস ইবনে কায়সান একবার আতা ইবনু আবি রবা'কে বলেছিলেন, আতা, কখনো তাদের কাছে কিছু চেয়ো না, যাবা বাত হলে দরজা লাগিয়ে দেয়, যারা দরজায়।[1]

চমৎকার একটি উর্দু বাণী

نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو تین باتوں کو اپنی عادت بنالو :نعمت پر شکر
تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ !

অন্তরের চিকিৎসা চাও তবে তিনটি জিনিস মনে রেখো। প্রথমত নিয়তের উপর সন্তুষ্ট, দ্বিতীয়ত কষ্টের উপর সবর, তৃতীয়ত গুনাহের উপর তওবা করো।

---

[1] তউস ইবনে কায়সান রহিমাহুল্লাহ। ইয়ামানের এই তাবেয়ী উম্মুল মুমেনিন আয়েশা সিদ্দিকা (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ এক মনিষী। শাসকদের কাছে ঘেঁষা অপছন্দ করতেন। সত্য বলায় ছিলেন নির্ভীক। কারো প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা প্রভাবিত হতেন না।

ইতিহাসের পাতা
যাদুস সালেকিন

উপসংহার

সব শেষ কিছু কথা খুবই গুরুত্বের সাথে বলতে চাই। আলোচনা ছিল আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার নিয়ে। আত্মা কিভাবে রোগাক্রান্ত হয় এবং তার প্রতিকারও কি তা পূর্বে আলোচনা হয়েছে। আত্মা আক্রান্ত হওয়ার আগে যদি সতর্ক থাকা যায় তাহলে রোগ হওয়া থেকে অনেকটা বেঁচে থাকা যাবে। ইনশাল্লাহ। সবকিছুর পেছনে একটা মূল থাকে রোগেরও মূল আছে, আর তা হচ্ছে পিতা-মাতা, সমাজ, শয়তান । পিতা মাতা হচ্ছে সন্তানের কাছে মডেল। তবে প্রত্যেক সন্তান তার মাকে বেশি অনুস্বরণ করে থাকে। মায়ের কিছু গুন অবশ্যই থাকা চাই, সত্য কথা বলা, মিতব্যয়ই, নির্লভ, হিংসা না থাকা, দ্বীনদারী হওয়া। যে বাচ্চা তার মাকে ছোটবেলা থেকে এভাবে দেখে বড় হবে তার অন্তর আশা করি আত্মার অনেক রোগ থেকে আক্রান্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। পিতা-মাতার আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া। আত্মার ব্যাধি থেকে বাঁচতে আরেকটা মূল কারণ হচ্ছে খারাপ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকা। দ্বীনদারদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। দ্বীনের ইলম অর্জন করা আর শয়তান থেকে বাঁচতে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য একে অপরের মাঝে সালামের অভ্যাস গড়ে তোলা। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যার মাসনুন দোয়া পড়া সালাতে যত্নশীল হওয়া। প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারেও যত্নশীল হওয়া অধিক প্রয়োজন। প্রতিটি হরফের হক ও আয়াতের হুকুম আহকাম মেনে এবং আদবের সাথে তিলাওয়াত করতে হবে। কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেও অনেকে আত্মার রোগে ভুগেন। অনেকের কাছে মনে হয় একরকম সুর করে পড়তে পারলেই হলো। এ ব্যাধিরও চিকিৎসা দরকার। অন্তরের ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট সবসময় দোয়া চাইতে হবে। আর চাইতে হবে ইখলাসের সাথে আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন আমিন।

২২৭ ব্যাচ এর শেষ দারসের নাসিহাহ

১.বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে হবে
২.হেদায়েতের পথে থাকার জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে হবে, তাউফিক কামনা করা আল্লাহর কাছে।
৩.কোনো ছোট আমলকে ছোট মনে না করা,কোনো ছোট গোণাহকে ছোট মনে না করা
যখন মুস্তাহাবে অভ্যস্ত হবো,তখন শয়তান আপনাকে দিয়ে শিরক কুফর করাতে পারবে না, ফরয ওয়াজিব ছাড়াতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ
৪.মৃত্যুর মোরাকাবা করা
~শ্রদ্ধেয় মুজিব উস্তায

IOM ২২৭ ব্যাচের স্টাডি গ্রুপ থেকে নেয়া।

মাআসসালাম